সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : টাকা গাছে ফলে না, নাড়া দিলে ঝরে না ▯

সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

নতুন রাজনৈতিক বাতাবরণের সম্ভাবনা এরাজ্যে ▯ ১০

প্রকৃত আর্থিক সংস্কার চাইলে কংগ্রেসকে উৎখাত করতেই হবে ▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ১১

সুদর্শনজী : দেশমাতৃকার চরণে এক সমর্পিত প্রাণ ▯ রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৩

পূজনীয় সুদর্শনজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ▯ সুনীলপদ গোস্বামী ▯ ১৫

আমার দেখা পরমপূজ্য সুদর্শনজী ▯ বাসুদেব পাল ▯ ১৬

কলকাতায় প্রয়াত সুদর্শনজীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ▯ ১৮

উমা আসার খবর আনেন উপেন বৈরাগী ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২২

চন্দননগরের বোড়াই চণ্ডী ▯ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ▯ ২৩

দেশের গোটা অর্থনীতিটাকেই বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত করার চক্রান্ত চলছে ▯ ওয়াই এস গুরুমূর্তি ▯ ২৮

দূষণের কবলে পবিত্র গঙ্গা ▯ ডঃ প্রবীর রঞ্জন শূর ▯ ৩১

জাতীয় নদী হিসেবে ঘোষণা, অথচ গঙ্গার গঙ্গাযাত্রা হতে চলেছে ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ৩২

কোকরাঝাড়ের দাঙ্গা এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশমাত্র ▯ ৩৬

এ আই টি এ-র কাছে মহেশদের এই শাস্তিই প্রাপ্য ছিল ▯

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ▯ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ ▯ ভাবনা-চিন্তা : ২০ ▯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ ▯ অন্যরকম : ২৭ ▯

উত্তরবঙ্গ : ৩৫ ▯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ ▯ চিত্রকথা : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১৪ আশ্বিন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ১ অক্টোবর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

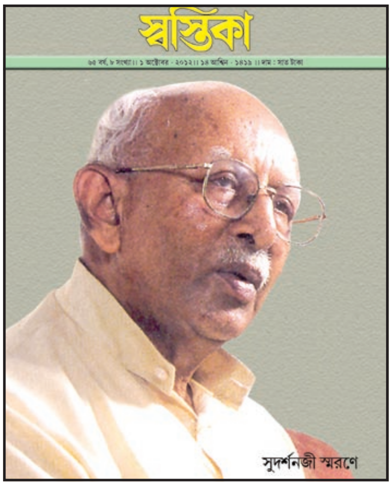

সুদর্শনজী স্মরণে : পৃঃ ১৩-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয় :

মহতী মাহাত্ম্যে মহালয়া

মহালয়া পিতৃপক্ষের শেষ এবং দেবীপক্ষের সূচনা। মহালয়ায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিপর্ব। হিন্দুদের যে কোনও শুভ কাজের পূর্বে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে তিল জল নিবেদন করতে হয়। বাঙালি তাই মাতৃআরাধনার পূর্বে স্মরণ করে পিতৃপুরুষদের বিদেহী আত্মাকে। আবার মহালয়া মানেই আকাশবাণীর অনুষ্ঠান ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। এই সব বিষয় নিয়েই আলোকপাত করেছেন **সংকর্ষণ মাইতি**।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

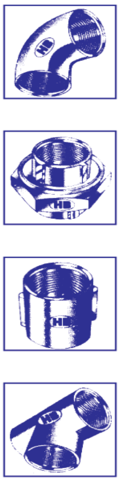

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE ®

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্ত

১৭১৭ সালে মোঘল সম্রাট ফারুকশিয়র ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কিছু বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধাযুক্ত একটি ফরমান প্রদান করিয়াছিলেন। ইতিহাসের পাতায় যাহা 'ফারুকশিয়র ফরমান' নামে খ্যাত। এই ফরমানের বলে বলীয়ান হইয়া বণিকের মানদণ্ড ক্রমে ক্রমে রাজদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। ইংরেজ বণিকরা ভারতে আসিয়াছিলেন ব্যবসা করিবার জন্য, কিন্তু কালক্রমে তাহারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া ভারতের শাসকে পরিণত হইয়াছিলেন। ইতিহাস হইতে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি পরাধীনতার গ্লানিকে অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করিয়া এদেশের কংগ্রেস সম্রাট মনমোহন সিং ইউরোপীয় তথা মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাকে কিছু বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধাযুক্ত একটি ফরমান জারি করিয়াছেন। আগামীদিনে বণিকের মানদণ্ডও একইভাবে রাজদণ্ডে পরিণত হইলে অবাক হইবার কিছু থাকিবে না। ১৯৯১ সালে শিল্পনীতি এবং উদারীকরণ নীতির ঘোষণার মাধ্যমে তৎকালীন নরসিমা রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতীয় বাজারকে বিশ্ব দরবারে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি প্রযুক্তি এবং কারিগরি দক্ষতাকে কাজে লাগাইয়া আমাদের দেশীয় শিল্পকে নতুন জমানায় রূপান্তরিত করিয়া দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক চলরাশিগুলিকে চাঙ্গা করা। এই অবাস্তব স্বপ্নের পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আজ মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছেন। বাজার আগুন হইবার ফলে দৈনিক বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইতেছে প্রতিটি নাগরিককে। সংস্কার আজ ঘাতকের চেহারা লইয়াছে।

খুচরো ব্যবসায় একশো শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের ছাড়পত্র উদারীকরণেরই একটি প্রক্রিয়া। আজ যখন বিশ্বের তাবড় তাবড় তথাকথিত শিল্পোন্নত দেশ নানা সঙ্কটে ধুঁকিতেছে তখন ভারতবর্ষের মতো এত লোভনীয় এবং নির্ঝঞ্ঝাট বিনিয়োগস্থল আর কোথায় মিলিবে? চীনের পর ভারতবর্ষই হইল দ্বিতীয় দেশ যেখানে আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থাগুলি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছে কীভাবে খুচরো ব্যবসার বাজারে থাবা বসানো যাইতে পারে। তাহাদের কাছে এই মুহূর্তের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং মুনাফা অর্জনকারী ক্ষেত্র হইল খুচরো ব্যবসা। আমেরিকার বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যে অবস্থায় তাহাতে ওবামাকে এই নির্বাচনে ভালো ফল করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে। অথচ সময় কম—আগামী ৬ নভেম্বর আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ওবামার উপর সেই দেশের বিনিয়োগকারীদের প্রবল চাপ রহিয়াছে, কারণ তাঁহারা চান তাঁহাদের ব্যবসার বিশ্বব্যাপী বিস্তার। মার্কিনবাজার বর্তমানে এমন স্থিতাবস্থায় পৌঁছাইয়াছে, যেখানে ব্যবসা বাড়ানোর আর কোনওরকম আশা নাই। সেই কারণেই ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির বিরাট বাজার ধরিবার লক্ষ্যে আমেরিকার এই আগ্রাসন। ওবামাকে নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করিতে হইলে মার্কিন জনমানসে এই বিশ্বাস তৈরি করিতে হইবে যে মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগ ও বিশ্বব্যাপী বিস্তারের ক্ষেত্রে ওবামা যথেষ্ট একনিষ্ঠ। ওবামার এই রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে বন্ধুত্বের হাত বাড়াইয়া দিতেই খুচরো ব্যবসায় এইরকম যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত লইয়াছেন তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু মনমোহন সিং। মনমোহন সিং বলিয়াছেন, কৃষকরা ইহার ফলে উপকৃত হইবে, কিন্তু অভিজ্ঞতা বলিতেছে দীর্ঘকাল এইরকম চলিতে চলিতে একদিন এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হইবে যেইদিন ওই বিদেশি কোম্পানীগুলি আর বেশি দামে ফসল কিনিতে চাহিবে না এবং উল্টোদিকে ক্রেতাদের নিকট হইতে বেশি দাম চাহিবে। ভারতবর্ষের মাটিতে ওয়ালমার্টের অনুসৃত এস ই জেড পন্থায় উৎপাদন শ্রম আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাইয়া 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' চালানো কতটা কার্যকর হইবে সে প্রশ্ন এখনই উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজা ছিলেন। ইহা খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক—গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমুদয় মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোনও মহাপুরুষ নূতনভাবে সমাজে এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায় প্রাচীনকালে এক-একটি সম্প্রদায় উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে এক-একখানি শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টি লোপ পাইয়াছে, শাস্ত্রখানি রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং অনুমান হয়, গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যাহা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু যাহার মধ্যে খুব উচ্চ ভাবসকল সন্নিবিষ্ট ছিল।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

অবিরল গঙ্গা নির্মল গঙ্গার দাবিতে সন্ন্যাসিনী উমা ভারতীর গঙ্গাসমগ্র অভিযান

বাসুদেব পাল, কলকাতা।। অবিরল গঙ্গা, নির্মল গঙ্গা— এই দাবিতে অবিরাম যাত্রা বিজেপি নেত্রী উমা ভারতীর। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন গত ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে। আর যাত্রার শুভারম্ভ ২১ সেপ্টেম্বর গঙ্গাসাগরে যথাবিধি পূজার্চনার পর। কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবার হয়ে যাত্রা পৌঁছেছে কলকাতা। ২১ সেপ্টেম্বর যথারীতি হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে গঙ্গাপূজা ও আরতি। এক অপার্থিব দৃশ্য ও আনন্দ। সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান।

বড়বাজারের জগন্নাথঘাটের গঙ্গাতীরে উমা ভারতী। ছবি : বাসুদেব পাল

গত ১৯ তারিখ কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সুশ্রী উমা ভারতী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসনের জনসভা, পদযাত্রা, মঞ্চে মাইক ব্যবহারের আগাম দেওয়া অনুমতি প্রত্যাহারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন— যাত্রা হবে। প্রয়োজনে তিনি গ্রেপ্তার বরণ করবেন। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। মঞ্চ ও মাইক ব্যবহার ছাড়া বাকি সব হয়েছে। যাত্রাপথে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। পায়ে পা মিলিয়েছেন। । এতেই তিনি অভিভূত। উমা ভারতীর বক্তব্য, গঙ্গা নদীর দূষণ রোধ ও অবিরল ধারাপ্রবাহের জন্য তিনি এই কর্মসূচী নিয়েছেন। যা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। সকল ভারতবাসীকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও রাজনৈতিক ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে তিনি এই কর্মসূচীকে সাহায্য করার জন্য বারবার আবেদন জানিয়েছেন। সাড়ে সাতশ' জন সাংসদকে পবিত্র গঙ্গাজল উপহার পাঠিয়েছেন। সকলেই তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

২২ সেপ্টেম্বর বৃষ্টি উপেক্ষা করে বড়বাজারের জগন্নাথঘাটে সকালেই ভিড় জমে। গঙ্গা-আরতি ও পূজা দেখার জন্য। বেদমন্ত্র সহকারে পূজার্চনা হয়। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ। জনৈক পুলিশ অফিসার কর্ডলেসে থানাকে খবর পাঠাচ্ছেন, কনভয়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। সব ঠিকঠাক চলছে। যাত্রা নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে দশটার কিছু পরে রওনা হয়ে যায়। বিজেপি'র স্থানীয় কাউন্সিলার ও প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনা দেবী পুরোহিত সহকর্মীদের নিয়ে পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় (তটে অবস্থিত) শিবমন্দিরের মাইকে ছোট্ট বক্তৃতা অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে। আগের দিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেশব ভবন কার্যালয়ে এসে সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তাদের সঙ্গে আলাপচারিতা, যাত্রার উদ্দেশ্য বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিনয়ের সৌজন্যবোধের পরিচায়ক।

কলকাতায় সঙ্ঘ কার্যালয় 'কেশব ভবনে' উমা ভারতী।

একান্ত সাক্ষাৎকারে আরও দুটি অনুষ্ঠানর কথা বললেন। আগামী ২০ নভেম্বর দেশ বিদেশের নদী ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সারা দিনের সম্মেলন এবং ২ ডিসেম্বর সারা ভারতে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে মানববন্ধন কর্মসূচীও চূড়ান্ত হয়েছে। কলকাতা থেকে যাত্রা রওনা হলো নবদ্বীপের উদ্দেশে। ২৪ তারিখ ফরাক্কা, মালদা হয়ে বিহারে প্রবেশ করবে যাত্রা। ২৮ অক্টোবর গঙ্গোত্রীতে এই যাত্রা শেষ হবে।

সংবাদ প্রতিবেদন

আদবানীর ব্লগে চাঞ্চল্যকর তথ্য

খোদ নিউইয়র্কে বিক্ষোভের মুখে পড়া 'ওয়ালমার্ট'কে মাথায় করে নিয়ে আসছেন মনমোহন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'সাট ওয়ালমার্ট আউট' না, এটি ভারতবর্ষের কোনও বড় শহর বা মফঃস্বলের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর নয়। এই খুচরো ব্যবসা শৃঙ্খলটির (রিটেল চেন) বিরুদ্ধে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে তো বটেই, খোদ নিউ ইয়র্ক সিটিতেই ওয়ালমার্টের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে এমনটাই বললেন বিজেপি-র বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী। তাঁর ব্যক্তিগত ব্লগে গত রবিবার তিনি জানিয়েছেন, তাঁর দল ক্ষমতায় থাকাকালীন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসের তৎকালীন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর একটি বিবৃতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারি আমলাদের ওপর প্রায়শই চাপ সৃষ্টি করা হোত। দাসমুন্সীর উদ্ধৃত বয়ান অনুযায়ী তৎকালীন সরকার নিয়োগ সংক্রান্ত যোজনা কমিশনের টাস্ক ফোর্স ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগোষ্ঠী খুচরো ব্যবসায়ে এফ ডি আই-এর যোগ দেওয়ার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিলেও বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানী পিছনের দরজা দিয়ে এটি চালু করার প্রচেষ্টায় আমলাদের ওপর লাগাতার চাপ আনত। শ্রী আদবানী দাসমুন্সীর বয়ান উদ্ধৃত করে আরও বলেন, 'বহুজাতিক সংস্থাগুলি আমলাদের মাধ্যমে সরকারকে খুচরো ব্যবসায়ে এফ ডি আই-এর বিনিয়োগ সংক্রান্ত দেশ বিরোধী সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে বাধ্য করানোর জন্য নিরন্তর অপচেষ্টা চালাত'। শ্রী আদবানীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই প্রসঙ্গে লোকসভায় শ্রী দাসমুন্সীর তোলা প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন এন ডি এ-র শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী অরুণ শৌরী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে ১৯৯৭ সাল থেকে বহাল থাকা নীতি অনুযায়ী খুচরো ব্যবসায়ে এফ ডি আই বিনিয়োগ দেশে অনুমোদিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রী দাসমুন্সীর উদ্দেশ্যে দেওয়া অরুণ শৌরীর আশ্বাসেরও উল্লেখ করেছেন শ্রী আদবানী। সেই বয়ান অনুযায়ী 'মন্ত্রীগোষ্ঠীর (জি ও এম) ন্যাশানাল ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিলের (বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত) আসন্ন অধিবেশনে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে (বাতিলের অনুমোদন যাতে তাঁরা এই মর্মে ওয়াকিবহাল থাকেন)। ব্লগেরএকবারে শেষাংশে শ্রী আদবানী পরিতাপের সঙ্গে বলেছেন, যখন জন্মদাতা দেশেরই বিভিন্ন শহরে 'ওয়ালমার্টের' বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দানা বাঁধছে তখনই আমাদের দেশের সরকার লাল কার্পেট অভ্যর্থনায় তাকে ডেকে নিয়ে আসছে!

কংগ্রেস ও খুচরোয় সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ, দুটোরই একটি ক্ষেত্রে মিল রয়েছে : উভয়েই বহু-ব্র্যাণ্ডে বিনিয়োগ করে।

কার্টুন সৌজন্যে : টাইমস অফ ইন্ডিয়া

জাফনায় ভারতীয় নৌবাহিনীর গতিবিধি জানতে আড়ি পাতছে আই এস আই

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলে জাফনাতে পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আই এস আই) একটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আড়ি পাতা যন্ত্র বসিয়েছে যা ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করতে পারে। সন্দেহ করা হচ্ছে, এই কুখ্যাত গোয়েন্দা এজেন্সী ভারতীয় নৌবাহিনী যোগাযোগের ক্ষেত্রে অযথা নাক গলাতে চাইছে। বিদেশে কর্মরত ভারতের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (র) গত তিন-চার মাস ধরে জাফনাতে আই এস আই-এর কাজকর্ম বাড়ছে বলে সতর্ক করে দিয়েছে। প্রাপ্তসূত্র অনুসারে ভারতীয় সাবমেরিনগুলির গতিবিধি জানার জন্য আই এস আই সেখানে গোপন খবর সংগ্রহের নানা সরঞ্জাম তৈরি করছে। র-এর রিপোর্ট অনুসারে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল (এন এস সি) সেক্রেটারিয়েট-এর উচ্চ পর্যায়ের সাম্প্রতিক এক বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং কৌশলগত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতির প্রতিরোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে স্থির হয়েছে। ডাইরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ভারতীয় নৌবাহিনীর যোগাযোগ রক্ষার সূত্রটির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অন্য একটি দেশকে লক্ষ্য করে তৃতীয় একটি দেশ যে তাদের জমি ব্যবহার করছে, তা প্রতিরোধে শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে চীনও কোকো আইল্যান্ড ও আন্দামানে ভারতীয় জাহাজগুলির গতিবিধি ও যোগাযোগের খবর গোপনে সংগ্রহের জন্য এমন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রবণযন্ত্র বসিয়েছিল।

মাত্র তিন মাসেই ৩২টি বড় প্রকল্পের তড়িঘড়ি অনুমোদন কেন দিলেন এন সি পি'র অজিত পাওয়ার?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এন সি পি নেতা অজিত পাওয়ার খেয়ালখুশি মতো বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ নানান প্রকল্পে চটজলদি অনুমোদন দিয়ে কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার মুখে পড়েছেন।

সংবাদে প্রকাশ ২০০৯ সালে মাত্র ৮ মাস মহারাষ্ট্রের জলসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন অস্বাভাবিক দ্রুততায় তিনি ২০ হাজার কোটি টাকা অর্থমূল্যের নানান প্রকল্প বিদর্ভ সেচ উন্নয়ন সংস্থার (ভি আই ডি সি) আবশ্যিক সম্মতি ছাড়াই প্রায় একার হাতেই অনুমোদন দিয়েছেন। সংবাদসূত্রের তথ্য অনুযায়ী পাওয়ার তৎকালীন ভি আই ডি সি-র কার্যকরী পরিচালক কেবলমাত্র ডি পি সিরকে-র সঙ্গে যোগসাজশে এই বিপুল বিনিয়োগের প্রকল্পগুলির অনুমোদন দেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত অনুযায়ী এই প্রশাসনিক অনুমোদনগুলি সর্বাংশে বেআইনি। প্রচলিত প্রশাসনিক বিধি অনুযায়ী অনুমোদন দেওয়ার আগে এই ধরনের প্রকল্পগুলি রাজ্যের মুখ্য সচিব ও অর্থ, পরিকল্পনা, কৃষি এবং জলসম্পদ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত নিয়ন্ত্রক সংস্থায় (Governing Council) উত্থাপিত হওয়ার পর সেখানে যথোপযুক্ত আলোচনা ও মতামত সাপেক্ষেই কেবল অনুমোদিত হতে পারে।

এই মর্মে সংবাদ সূত্রের পাঠানো একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর কোনও জবাব অজিত পাওয়ার দেননি। পক্ষান্তরে তাঁর কার্যালয় থেকে উল্লেখিত শ্রী সিরকের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই মতো টেক্সট মেসেজ ও একাধিক ফোনালাপ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সংবাদে প্রকাশ ৩৮টি অনুমোদিত সেচ প্রকল্পের মধ্যে ১৭,৭০০ কোটি টাকা মূল্যের ৩২টি প্রকল্প জুন থেকে অগাস্ট মাত্র ৩ মাসের মধ্যেই অনুমোদন পেয়ে যায়। উল্লেখ্য, এই অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে আবার বেশ কিছু রাজ্যে নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

অজিত পাওয়ার

সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী শ্রী পাওয়ার ও সিরকে ছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অত্যন্ত অধস্তন আধিকারিকরাই এই সব ছাড়পত্রে সই করেছেন। অনুমোদনের নথিপত্রে কোথাওই কোনও প্রবীণ সরকারি আমলা এমনকি জল সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সচিবেরও কোনও অনুমোদনের নজির নেই। এই সচিবই পদাধিকারবলে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিদর্ভ সেচ উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনুমোদন হঠাৎ করে দেওয়া হলেও পরবর্তীকালে এগুলির বিধিবদ্ধ পর্যালোচনা ও সরকারি আইন- কানুন মোতাবেক অনুমোদিত করাতে বহু সময় লেগে যায়। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে প্রকল্প খরচ। উদাহরণ স্বরূপ নিম্ন পেনগঙ্গা (ইয়তমাল জেলা) প্রকল্পের ১৯৯৭ সালের অনুমোদিত ব্যয় ১৪০২ কোটি টাকা থেকে ২০০৯ সালে প্রায় দশগুণ বেড়ে ১০,৪২৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এমন উদাহরণ ভুরিভুরি। আদতে প্রকল্প অনুমোদনকারীদের অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও জনগণের করের টাকার এমন অপব্যয় কংগ্রেস ও তার সহযোগী সরকার এখন প্রায় অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন। — ব্যবস্থাপক

টাকা গাছে ফলে না, নাড়া দিলে ঝরে না

মাননীয় মনমোহন সিং,
প্রধানমন্ত্রী,
৭নং রেস কোর্স রোড, নয়াদিল্লি,

Money does not grow on trees. টাকা গাছে ফলে না। জাতিকে নতুন একটা কথা শেখালেন আপনি। স্বাভাবিক। আপনার মতো বিখ্যাত অর্থনীতিবিদই তো এমন জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে পারেন। সেদিন তৃণমূলের ধাক্কায় সরকার সংখ্যালঘু হয়ে যেতেই এফ ডি আই, রান্নার গ্যাস কিংবা ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সাফাই দিয়েছেন আপনি। দাবি করেছেন এফ ডি আই কার্যকর হলে ছোট ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কৃষকরাও লাভবান হবেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের সন্ধি বিচ্ছেদ হতেই আপনারা আপাতত সংখ্যালঘু। সরকারের নতুন বন্ধু খোঁজা থেকে মন্ত্রিসভাকে নতুন রূপ দেওয়ার চাপের মধ্যেই সাত তাড়াতাড়ি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আপনার সেই অকাল ভাষণে খুব কিছু আশাও করেননি দেশবাসী। তাই আপনি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে সংস্কারেরই জয়গান গেয়েছেন। ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কারের ধ্বজাবাহক মনমোহন সিংয়ের গলায় সেটাই তো স্বাভাবিক। দেশ জুড়ে যখন এফ ডি আই নিয়ে আতঙ্ক তখন আপনি এক কথায় বুঝিয়ে দিলেন, এফ ডি আই আসলে কৃষকবন্ধু, ছোট ব্যবসায়ীদের বন্ধু।

সেদিন আপনি যখন ভাষণ দিচ্ছেন তখন মনেই হচ্ছিল না রাজীব গান্ধী সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে একদিন জনমোহিনী বাজেট পেশ করতেন এই মনমোহন সিং। আর আজ সংস্কারের গতি কমাতেই মার্কিন দেশে আপনার নিন্দা শুরু হয়ে গেছে। নিন্দিত আপনার অন্তরাত্মা সোনিয়া গান্ধীও। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আপনার মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠছিল। তখন এমন সিদ্ধান্ত তো নিতে হোতেই। কিন্তু সেসব না বুঝে বিজেপি-র সঙ্গে গলা মিলিয়ে শরিক, সমর্থকরাও সমালোচনায় বিদ্ধ করছে ইউ পি এ-টুকে। ছ'টির বেশি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে ভর্তুকি তোলার সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে আপনি বলেছেন, দেশের ৫০ শতাংশ পরিবারের ক্ষেত্রে বছরে ছটি সিলিন্ডারই যথেষ্ট। এই পরিসংখ্যান কেউ মানুক না মানুক আমি জানি সত্যি। কারণ, ১২১ কোটির দেশে মোটামুটি পরিবারের সংখ্যা মোটামুটি ২৫ কোটি। এর মধ্যে একটা অংশের রান্নাবান্নার বালাই নেই। নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। বাকি দারিদ্র্যসীমার নিচে একটা বড় অংশ।

করলেও রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যের প্রাপ্য স্বীকৃতি আজও অধরা রয়ে গেছে। এই বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হবে।

(৩৮) দেশের সুর া সার্বভৌমত্ব ও সম্মানকে সরলতর করা এবং আর্থ-বাণিজ্যিক মঙ্গলকে ত্বরান্বিত করার ল ্যকে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দিয়ে পরিচালিত হবে দেশের বিদেশ নীতি।

(৩৯) দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সুফলকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হবে এবং দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজেকে দেশের উন্নয়নের একজন ভাগীদার (Stake holder) রূপে ভাবতে পারেন সেদিকে ল ্য রাখতে হবে। আর সেই ল ্যেই রচনা করতে হবে জাতীয় উন্নয়নের রূপরেখা।

(৪০) বীমা - রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প র া ও শক্তিশালী করা।

(৪১) শপিং মলের খুড়োর কল বন্ধ করতে হবে।

(৪২) খুচরো ব্যবসাতে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ হবে।

(৪৩) বীমাসংস্থা বিলগ্নিকরণ করে বেসরকারি হাতে দেওয়ার বিরোধিতা করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

(৪৪) ভবিষ্যনিধি তহবিলে আমানতকারী শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সুদের হার বৃদ্ধির দাবি করবে দল।

(৪৫) স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার বৃদ্ধির দাবি জানায় তৃণমূল কংগ্রেস।

(৪৬) উন্নতমানের বীজ, সার সরবরাহ ও কালোবাজারি খতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে তৃণমূল কংগ্রেস।

(৪৭) সংখ্যালঘু, মহিলা, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য চাকরির ে ত্রে অগ্রাধিকারের দাবি করছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রয়োজনে সংর ণের দাবিও করা হবে।

ভারতবর্ষ বরাবরই রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ মেনে এসেছে। কিন্তু এখন প্রয়োজন রাষ্ট্রপুঞ্জ ও নিরাপত্তা পরিষদের গণতন্ত্রীকরণ। ভারতবর্ষ যেন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে পারে তার নিরন্তর চেষ্টা চালাতে হবে।

দ ি ণ এশিয়ার সমস্ত প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের স্বার্থে সার্ক সহযোগিতাকে আরও জোরদার করতে হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস শুধু অর্থনীতির বৃদ্ধির হার বাড়লেই দেশের উন্নয়ন হয় বলে মনে করে না। তার সাথে মানব উন্নয়ন সূচকেরও উন্নতি হওয়া দরকার। সেজন্য ব্যাপক শি া ও স্বাস্থ্যের প্রসার হওয়া প্রয়োজন। সকলের জন্য শি া ও স্বাস্থের ল ্যে শি ার কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ ও স্বাস্থ্যে কেন্দ্রীয় বাজেটের ৫ শতাংশ খরচ করতে হবে।

সারা দেশের কথা ভেবেও তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবাংলার প্রতি বিশেষ ল ্য রাখতে চায়। পশ্চিমবাংলার মানুষ যে দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে, লোকসভার মাধ্যমে তা সারা দেশের মানুষকে জানাতে চায়, আবার পশ্চিমবাংলার সমস্ত আটকে থাকা প্রকল্প যাতে দ্রুত কেন্দ্রের অনুমোদন পায়, তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভায় চাপ সৃষ্টি করবে।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার, পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন ২০০৯ (৮১)

তৃণমূলের ২০০৯ সালের লোকসভার নির্বাচনী ইস্তাহারের ৮১ পৃষ্ঠা। ৪২ নং দাবিতে এফ ডি আই-এর প্রতি সমর্থন।

এর ওপর আছে একটুর জন্য দারিদ্র্যসীমা টপকানো নিম্নবিত্ত শ্রেণি। সব মেলালে ৫০ শতাংশ হয়ে যাবে। সুতরাং আপনার দাবি ঠিক। একশ ভাগ ঠিক।

সুতরাং একদম ভাববেন না। চালিয়ে যান আপনার সংস্কার নীতি। গরিবের কথা না ভেবে বরং 'গরিবি হঠাও' নীতি ঢের ভাল। গরিবকে হঠিয়ে দেওয়াই ভাল। কারণ ওরা মানে গরিবরা ভাল করে জানে, টাকা গাছে ফলে না। ঝাঁকি দিলেও পড়ে না। ওরা এটাও জানে যে কিছু কিছু গাছে টাকা ফলে। সে গাছ অনেক লম্বা। আঁকশি দিয়েও নাগাল পাওয়া যায় না।

চিন্তা নেই মনমোহনবাবু, ওরা এফ ডি আই বোঝে না। সেটা খায় না মাথায় মাখে তাও বোঝে না। খালি বোঝে বাজার করতে গেলে খালি ব্যাগে ফিরতে হয়। আন্তর্জাতিক বাজার বোঝে না। বোঝে ছোট্ট ছেলেটাকে এক টুকরো মাছ খাওয়ানো যাবে না। পুজোয় জামা কাপড় দেওয়া যাবে না পরিবারের কাউকে। মায়ের চিকিৎসার ওষুধটা বন্ধ করতে হবে। বাবার ভাগের দুধটা কমাতে হবে। কারণ, Money does not grow on trees. টাকা গাছে ফলে না। নাড়া দিলে ঝরে না।

তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। উনি আসলে রাজনীতিটুকুই বোঝেন। সেজন্যই উনি নমাজ পড়েন, গরীবের জন্য কাঁদেন, সমর্থন করেন, সমর্থন তোলেন। এই যে উনি আপনাকে এত গালাগাল করছেন তার জন্য যদি ওঁকে জবাব দিতে চান তবে ওঁকে মনে করান ২০০৯ সালে লোকসভা ভোটের আগে ইস্তাহারে এফ ডি আইকে সমর্থন করেছিলেন? অনেকে বলছেন তখন তিনি বা তাঁর দল এটা যে রাজনীতির ইস্যু হতে পারে বুঝতে পারেননি। বিষয়টা খায় না মাথায় মাখে তাও জানতেন না। এখন যদিও অস্বীকার করছেন (দলের ওয়েবসাইট থেকে তুলেও নিয়েছেন) কিন্তু কারও কারও কাছে সে ইস্তাহারের কপি রয়ে গেছে। আমি সেই ৮১ নম্বর পাতার ফোটো কপি পাঠালাম। আপনার কাজে লাগতে পারেন। আমি আপনার জন্য এত যে ভাবছি বিনিময়ে একটাই অনুরোধ। দেশ বিক্রি করার আগে একটু ভাববেন প্লিজ।

— **সুন্দর মৌলিক**

নতুন রাজনৈতিক বাতাবরণের সম্ভাবনা এ রাজ্যে

নিশাকর সোম

'পবিত্র জুম্মাবারে নমাজের পর আমাদের মন্ত্রীরা ইস্তফাপত্র প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর হাতে তুলে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তথা ইউপিএ-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে।' —এ ঘোষণা তৃণমূলের একমাত্র নেত্রীর। এই ঘোষণা কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের ৪০ মাসের মধুচন্দ্রিমার যবনিকা পতন হলো। বর্তমানে এই পদত্যাগ এবং ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে মমতা ঘোষণা করেছিলেন— 'এফ ডি আই, ডিজেলের মূল্য ও রান্নার গ্যাস-এর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জন্য এই চরম ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে।' একইসঙ্গে মমতা বলেছিলেন, 'এ সরকার আর ৪ থেকে ৬ মাস টিকবে।' তৃণমূলের সাংসদদের যে সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা চলেছিল। অতীতে এই ধরনের তৃণমূলের সভা খুব জোর এক ঘণ্টায় শেষ হয়েছে। এই সভার শেষে সুলতান আহমেদ সভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং বলেন, সভায় কোনও বিরোধিতা দেখা যায়নি। তালি বাজিয়ে নাকি সকলে সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। সভা দীর্ঘ হওয়ার দুটি কারণ— (১) মমতা শেষ মুহূর্তে সোনিয়া গান্ধীর ফোন আশা করছিলেন। এর কারণ মমতার তোষামোদকারী সাংবাদিক-সাংসদ লিখেছিলেন, মমতা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-নেতৃত্বের কাছে অপরিহার্য। এই কথার কারণ হলো লোকসভার ১৯ জন সদস্য নিয়ে মমতা চাপ দেওয়ার কৌশল নিয়েছিলেন। আর কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ধীরে ধীরে নিজেদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন তৈরি করে এ রাজ্যের কংগ্রেসকে মমতার অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় সরকার তথা তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পি চিদাম্বরম নানা বক্তব্য রেখে এবং নানা ব্যবস্থা নিয়ে ৩৪ বছরের বাম-শাসনকে নির্বাসিত করার ব্যাপারে বিশাল সাহায্য করেছিলেন। এই কারণেই মমতা ভেবেছিলেন এবারও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁর চাপের কাছে মাথা নত করবেন। সকলেরই মনে আছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মমতা একাধিক প্রার্থীর নাম জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং শেষকালে 'গভীর দুঃখের সঙ্গে' প্রণব মুখার্জির প্রার্থী পদ সমর্থন করেছিলেন।

বর্তমানে আমেরিকান সংবাদপত্রের 'ট্র্যাজিক ব্যক্তি' মনমোহন সিং এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের আর পিছু হটার অবস্থা ছিল না। তাঁরা আমেরিকার কাছে কি দায়বদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? ভবিষ্যতে তা প্রকাশ পাবে। মমতা বলেছেন, 'কংগ্রেস মিথ্যাবাদী'। কারণ এই বিষয়গুলি নিয়ে কংগ্রেস-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কোনও কথা তাঁদের অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে

বলেননি। জবাবে কংগ্রেস নেতৃত্ব বলেছেন, বহুবার একথা জানানো হয়েছে। এইসব আলোচনা সভায় তৃণমূলী মন্ত্রীরা অনুপস্থিত থেকে ছিলেন। একথা সকলেই জানেন যে যে বিষয়গুলি বিরোধিতা করার জন্য মমতা চরম ব্যবস্থা নিলেন, সেগুলি বহুচর্চিত। তখন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি। এখন কেন এই চরম ব্যবস্থা নিলেন মমতা? সর্বোপরি মমতা রাজ্যের জন্য মনমতো আর্থিক প্যাকেজ না পাওয়ার জন্য ক্ষোভে ফুঁসছিলেন।

আর একটি বিষয় দেখা যাচ্ছিল 'মমতা ম্যাজিক' ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে এবং তৃণমূল দলের মধ্যে মমতা-বিরোধী মনোভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে কবীর সুমন-এর প্রকাশ্য সমালোচনা এবং সোমেন মিত্র, সুচারু হালদার ও দীনেশ ত্রিবেদীদের সমালোচনা। উল্লেখ্য, দীনেশ ত্রিবেদী রেলের ভাড়া সামান্য কয়েক পয়সা বাড়ানোর জন্য মন্ত্রিত্ব খোয়ালেন অথচ রেলের মাশুল দ্বিগুণ তিনগুণ করা হলো, রেলের গুডস ট্রেনগুলিকে টেন্ডার ডেকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হলো, সে ব্যাপারে 'জন-দরদী' মমতার সমর্থন ছিল এবং আছেও।

মমতার জনদরদী ভূমিকার কারণগুলি হলো--- (১) টাটার কাছে মামলায় রাজ্য-সরকারের পরাজয়। (২) সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে। (৩) সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির কথা বলে চতুর্থ শ্রেণীর রমরমা না কমিয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসকদের অপমানিত করা। (৪) শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে— কিন্তু শিক্ষণের দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে করার কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে মমতা সমর্থক শিক্ষাবিদ সুনন্দ স্যানাল, তরুণ সান্যাল-এর বিরোধিতা প্রকাশ্যে এসেছে। (৫) কার্টুন, পার্ক স্ট্রিট-এ নারীনিগ্রহ নিয়ে জন-অসন্তোষ এবং দময়ন্তী সেনের অপসারণ।

মমতা কি সত্যই কেন্দ্রীয় সরকারের এফ ডি আই, ডিজেলের মূল্য ও রান্নার গ্যাস-নীতির বিরোধী? তাই যদি হয় তবে এই বিষয়ের বিরুদ্ধে ডাকা বিজেপি-র ভারত বন্‌ধ এবং বামফ্রন্টের সাধারণ ধর্মঘটের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সশস্ত্র আক্রমণ এবং প্রশাসনের তীব্র নখরযুক্ত থাবা দেখা গেল কেন?

এখানেও মমতার একনায়কত্ব দেখা যাচ্ছে। তাঁর এবং তাঁর চাটুকারদের বক্তব্য হলো--- 'মমতা তো প্রতিবাদ করেছেন, অন্যদের কি দরকার বন্‌ধ করার?' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মমতা বন্‌ধকে রোধ করার জন্য আইন আনছেন। পরিবহনকে ভাঙচুর করার বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আইন তৈরি হচ্ছে। এসব দেখে আশ্চর্য লাগে যে মমতা ও তাঁর দল বারবার বনধ্ করে, সরকারি অফিস, ট্রাম, বাস ধ্বংস করে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। এখনও তিনিই বিরোধী শক্তিকে স্তব্ধ করার জন্য আইন তৈরি করতে চাইছেন। ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস— এটাকে কি ফ্যাসিবাদের পদক্ষেপ বলা যায় না কি? মমতার সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমন নীতি চালানোর উদাহরণ হলো—বিজেপি নেতা তথাগত রায় এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাহুল সিন্‌হার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা প্রয়োগ করে মামলা করা হয়েছে। মমতা এখন ক্ষিপ্ত হয়ে নানান অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিন্তু নেবেন।

প্রকৃত আর্থিক সংস্কার চাইলে কংগ্রেসকে উৎখাত করতেই হবে

অমলেশ মিশ্র

ভারতরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সেই সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এই মধ্য সেপ্টেম্বরের কার্যকলাপ--- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতার দুটি লাইন মনে করিয়ে দিচ্ছে।

সে বড় সুখের সময় নয়
সে বড় আনন্দের দিন নয়

পরপর কয়েকটি কেলেঙ্কারী, অভিযোগে একান্ত বেকায়দায় পড়া ড. মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ এবং ১৪ তারিখে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১. ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৫ টাকা বাড়ানো।

২. রান্নার গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ— বছরে ছয়টি সিলিন্ডার ভর্তুকি মূল্যে এবং এর বেশি প্রয়োজন হলে বাজার মূল্যে (মোটামুটি ৬টি ৪০০ টাকা করে, বাকিগুলি প্রায় ৯০০ টাকা করে)।

৩. খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী কোম্পানী নামতে পারবে। অর্থাৎ ওয়ালমার্ট, ট্রেসকো, ব্যারিফোর, ক্যাশ এন্ড ক্যারি, মার্কস এন্ড স্পেন্সার প্রভৃতি কোম্পানী খুচরো ব্যবসা করতে পারবে।

৪. অসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রেও বিদেশী বিমান সংস্থা ভারতের মধ্যে তাদের বিমান পরিবহন ব্যবসা চালাতে পারবে।

সরকার এই সব পদক্ষেপের পক্ষে যেসব যুক্তি দিয়েছেন সেগুলির সারাংশ হলো—

১. রাজস্ব ঘাটতি কমাতে হবে।

২. বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়ার নির্ভরতা কমাতে হবে।

৩. কৃষি, স্বাস্থ্যে ও শিক্ষায় সরকার আরও গুরুত্ব দেবে।

কমনওয়ে গেমস্, টু জি স্পেকট্রাম ও

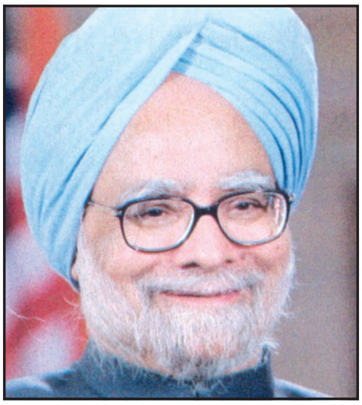

মনমোহন সিং

কয়লা ব্লক কেলেঙ্কারীতে এই সরকার অভিযুক্ত। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করে বিজেপি-র নেতৃত্বে এন ডি এ ভুক্ত দলগুলি সংসদের বাদল অধিবেশন অচল করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতি প্রসঙ্গ কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা কমিয়ে দিয়েছে বলে অনুমান। এই পরিস্থিতিতেও কেন্দ্রীয় সরকার এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন— যে

পি চিদাম্বরম

সিদ্ধান্তগুলি জনগণের সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী। ৫০ বছর ধরে কংগ্রেস এদেশ চালাচ্ছে— তবু দেশে দরিদ্রের সংখ্যা কমছে না। এই পদক্ষেপগুলি দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশকে যথেষ্ট খারাপ অবস্থায় ফেলবে। ডিজেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিসপত্র এবং পরিবহণ-এর দাম বাড়তে বাধ্য। গ্যাস সিলিন্ডার-এর নয়ানীতি মধ্যবিত্তদের খরচ বাড়াবে। আর খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী কোম্পানীর ব্যবসা করার সুযোগ-এদেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বজ্রাঘাত করতে পারে। ওয়ালমার্ট কোম্পানী ডাল-তেল-সরিষা বিক্রী করছে দেখলে দেশী ভুষিমাল দোকানের ক্রেতা কমতে পারে।

এই ঘোষণার পরে পরেই দেশের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে

> **বিরোধিতার মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকার অনড় আছে। এর একমাত্র কারণ কংগ্রেস জানে যে বিরোধীরা কখনও ঐক্যবদ্ধ হবে না। তারা ঐক্যবদ্ধ হলে সরকারের পতন অনিবার্য। কিন্তু সাতমণ তেল পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।**

সরকারের বিরুদ্ধে। বিজেপি সহ এন ডি এ ভুক্ত দলগুলি, বামফ্রন্ট ভুক্ত দলগুলি, বিজু জনতা দল, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজপার্টি, তেলুগু দেশম ইত্যাদি।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সরকার গঠনকারী দলগুলির মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসও এই পদক্ষেপগুলির বিরোধিতা করেছে এবং সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থনকারী দলগুলির মধ্যে সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজবাদী পার্টিও এই পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে তাদের মতামত জ্ঞাপন করেছে।

এত বিরোধিতার মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকার অনড় আছে। এর একমাত্র কারণ কংগ্রেস জানে যে বিরোধীরা কখনও ঐক্যবদ্ধ হবে না। তারা ঐক্যবদ্ধ হলে সরকারের পতন অনিবার্য। কিন্তু সাতমণ তেল পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। লোকসভার ৫৪৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৬, তৃণমূল কংগ্রেস-১৯, ডি এম কে ১৮, এন সি পি-৯ মোট ২৫২। প্রয়োজন ২৭২। প্রয়োজনীয় বাকী সমর্থন আরও ছোট দলগুলি দিচ্ছে কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব পাওয়ার বিনিময়ে। সর্বশেষে উদাহরণ— মন্ত্রী অজিত সিংহ— ৪ সাংসদের মালিক। এছাড়াও এই সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন দিচ্ছে সমাজবাদী পার্টি— সাংসদ সংখ্যা ২৩ এবং বহুজনসমাজ পার্টি— সাংসদ সংখ্যা-২১। মোট ৪৪।

এই কেন্দ্রীয় সরকারের পতন কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু কেন্দ্রে সরকার বিরোধী শক্তিগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত। (১) বিজেপি এবং এন ডি এ ভুক্ত অন্যান্য দল (২) সিপিএম, সিপিআই ফঃ বঃ, আর এস পি, সমাজবাদী, বহুজন সমাজবাদী, তেলুগুদেশম, জনতা দল (এস), বিজু জনতা দল— ওরা সকলে মিলে তৃতীয় ফ্রন্ট খোলার কথা ভাবছেন (আগেও ভেবেছেন)।

মজা হলো, এই দলগুলির প্রত্যেকটিই বলে যে সেই দলটি জনস্বার্থে নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু জনস্বার্থে তারা কখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না— এতটাই ছুঁৎমার্গ। সরকার বিরোধী দলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিজেপি। কিন্তু বিজেপি-র নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হলে ওদের জাত যাবে— তাই তারা পৃথক থাকবে। তার ফলে কংগ্রেস সরকারে থাকে থাকুক, ডিজেলের দাম বাড়ে বাড়ুক, খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশীরা আসে আসুক কিন্তু বিজেপির সঙ্গে একযোগে কখনওই নয়। এক কথায় এদের 'ছুঁৎমার্গ চিন্তা', 'জনস্বার্থ' চিন্তার থেকে অনেক বড়।

প্রসঙ্গত, এই রাজ্যের প্রধান দলটির কথা এসে যায়। তৃণমূল কংগ্রেস, গত ৩৪ বছরে বামদলগুলি এই রাজ্যে এমন একটি কংগ্রেস বিরোধী পরিমণ্ডল তৈরী করেছে যে এই রাজ্যে সরকারে থাকতে গেলে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের বিরোধিতা করতেই হবে। অন্যথায় বামফ্রন্টের হাতে তথাকথিত জনস্বার্থ রক্ষার নেতৃত্ব চলে যাবে। তৃণমূল কেন্দ্রে সরকারে থাকবে, মন্ত্রিত্ব তথা অন্যান্য সুযোগ নেবে, আবার বিরোধিতাও করবে। ক্যাবিনেট সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ক্যাবিনেট বৈঠকে যাবে না। ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেবে, তৃণমূল বলবে তাদের না জানিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাদের ঘোষিত নীতি যে কেন্দ্রে সরকার টিকিয়ে রাখব। অর্থাৎ কেন্দ্রে সরকার এমন কিছু মারাত্মক কাজ করেনি যে তার পতন ঘটাতে হবে। আবার রাজ্যে ক্ষমতায় থাকতে গেলে কংগ্রেস বিরোধিতা বাধ্যতামূলক। ডিজেলের দাম বাড়লে প্রতিবাদ করতেই হবে। কয়লা দুর্নীতি বা টেলিকম দুর্নীতি নিয়ে চুপ থাকলেও চলবে। কংগ্রেস অসৎ জেনেও তৃণমূল তাকে সমর্থন করবে— অর্থাৎ তৃণমূলের ধারণায় কংগ্রেসের থেকেও অসৎ কংগ্রেস বিরোধীরা। তাই দুই খারাপের মধ্যে কম খারাপ কংগ্রেসকে তারা কেন্দ্রে রাখতে চায়। আর সরকার চালাতে গিয়ে তারা যদি জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়, জনজীবনে দুর্দশা নামিয়ে আনে, তাহলে আছে মাইক, আছে সভামঞ্চ, আছে জনগণ। বক্তৃতাতে কী না হয়। সাপও মরে না, লাঠিও ভাঙ্গে না। ভোট পাওয়া যায়।

এই সব দলের এই সব বিপ্লব, বিদ্রোহ প্রতিবাদ কেন্দ্রের সরকারকে দুর্বলতর করার পরিবর্তে সবলই করবে— আরও ঘাতসহ হয়ে এই সরকার আরও বোঝা চাপাবে জনগণের উপর। অজুহাত হবে আর্থিক সংস্কারের প্রয়োজন। কিন্তু সংস্কার কার স্বার্থে? এই দেশে নিম্নতম আয় থেকে উচ্চতম আয়-এর ফারাক অপরিসীম। আর্থিক সংস্কারের সুযোগে কালোটাকা বেশী তৈরি হয় এবং বিদেশের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত হয়। ১৯৯১ থেকে অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর আর্থিক সংস্কার শুরু হয়েছিল। যারা খবর রাখেন তারা জানেন যে ওই সময় থেকেই বিদেশের ব্যাংকে কালো টাকা সঞ্চয়ের পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। দেখা গেছে আর্থিক সংস্কার ও কালো টাকা সমানুপাতিক। অপর দিকে আর্থিক সংস্কার ও জনসাধারণের জীবন ধারণের মান অসমানুপাতিক।

এই রাষ্ট্রের এখন একমাত্র আর্থিক সংস্কারের কাজ হলো কালো টাকা উদ্ধার এবং দুর্নীতি তথা ভ্রষ্টাচার বন্ধ করা। পেট্রল, ডিজেলের দাম বাড়িয়ে, খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী কোম্পানীকে সুযোগ দিয়ে আর্থিক সংস্কার হবে না। আরও চুরি, আরও দুর্নীতি আরও কালোটাকা হবে। কংগ্রেস চায় ভারতবর্ষ পরমুখাপেক্ষ থাকুক। বিগত ৬০ বছরের ৫০ বছরই কেন্দ্রে কংগ্রেস শাসন ছিল। আজ যদি এই রাষ্ট্রে দুর্বিপাক দেখা দিয়ে থাকে তার জন্য ভর্তুকী ব্যবস্থা দায়ী নয়— দায়ী কংগ্রেসই। সেই কংগ্রেসকে যারা কেন্দ্রে ক্ষমতায় রাখতে চায় প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে— সে দলের নাম তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী, সিপিএম, বহুজন সমাজবাদী, ডি এম কে, টি ডি পি বা যা-ই হোক না কেন— তারা 'জনস্বার্থ নিয়ে চিন্তিত' একথা বলা যায় না। অতএব এদের আন্দোলন, বিপ্লব, কঠোর সমালোচনা ইত্যাদি সবই ঠকদের ঢপবাজী।

আর্থিক সংস্কারের উপায় হোক— (১) কালো টাকা উদ্ধার (২) দুর্নীতির দূরীকরণ (৩) মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং (৪) আত্মশক্তির বিকাশ। এগুলি করতে গেলে (৫) কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার উৎখাত করতে হবে।

সত্যিই, এ বড় সুখের সময় নয়
এ বড় আনন্দের দিন নয়—
....
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাত্রে।

সুদর্শনজী : দেশমাতৃকার চরণে এক সমর্পিত প্রাণ

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক মহাজীবনের অবসান হয়ে গেল গত ১৫ সেপ্টেম্বর শনিবার, সকাল ৬.৫০ মিনিটে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক বর্তমানে স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত পূজনীয় কুপ্পহলী সীতারামাইয়া সুদর্শন (যিনি পূজনীয় সুদর্শনজী নামেই সারা দেশে পরিচিত) রায়পুরে সঙ্ঘ কার্যালয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সঙ্গে সুদর্শনজীর পরিচয় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে। তিনি যখন মধ্যপ্রদেশের প্রান্ত প্রচারক, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি স্বয়ংসেবক। পূর্বপুরুষ কর্ণাটক প্রদেশের মান্ড্যা জেলার কুপ্পহলী গ্রামের বাসিন্দা। জন্ম মধ্যপ্রদেশের, বর্তমানে ছত্তিশগড় প্রদেশের রাজধানী রায়পুর শহরে। লক্ষণীয়, জন্ম এবং মৃত্যু একই শহরে। তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র, সুকণ্ঠ গায়ক, নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দীর্ঘদেহী সুপুরুষ চেহারা। মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত 'সাগর বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক হন ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়ে (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)। ১৯৬৪ সালে সঙ্ঘের প্রচারক হন। ১৯৭৭ সালে উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক হয়ে কলকাতায় আসেন। তখন বাংলা, বিহার ও অসম নিয়ে উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্র।

কলকাতার ভবানীপুর নিবাস ছিল তাঁর কেন্দ্র। তখন নিয়মিত তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আমার হয়েছে। পরে তিনি অখিল ভারতীয় শারীরিক প্রমুখ হয়ে নাগপুরে যান। বেশ কয়েক বছরের জন্য তিনি অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব বহন করেছেন। সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতির খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পনে থাকত। তিনি ছিলেন বহু-ভাষাবিদ। অত্যন্ত সুবক্তা, কান্নড়, মারাঠী, হিন্দী, বাংলা, ইংরাজীতে তিনি ভাষণ দিতেন। ভারতের প্রায় সব ভাষাই তিনি জানতেন। তিনি দার্শনিক, চিন্তাবিদ, দূরদ্রষ্টা আধুনিক যুগের ঋষি। সঙ্ঘকাজের জন্য তিনি ইউরোপ, আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন।

নাগপুরে সুদর্শনজীর শেষকৃত্যে শ্রদ্ধা নিবেদন মুসলমানদের।

২০০০ সালের মার্চ মাসে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক নাগপুরে হয়। সরকার্যবাহের নির্বাচন হবে। আমাদের একটা ভাবনা চলছিল যে, হয়ত পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংজী (রজ্জু ভাইয়া) স্বাস্থ্যের কারণে সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। মাননীয় শেষাদ্রিজী (তখন তিনি সরকার্যবাহ) সরসঙ্ঘচালক হবেন। কিন্তু মাননীয় শেষাদ্রিজী পুনরায় সরকার্যবাহ নির্বাচিত হলেন। তখন আমাদের ভাবনা তাহলে কে সরসঙ্ঘচালক হবেন? পরম পূজনীয় রজ্জু ভাইয়া নিজে দায়িত্ব মুক্তির কথা ঘোষণা করে সহ-সরকার্যবাহ মাননীয় সুদর্শনজীর নাম পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক হিসাবে ঘোষণা করলেন। ওইদিন সন্ধ্যায় রেশমবাগের পাশের মাঠে নাগপুরের স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের বিশাল সমাবেশে তাঁকে 'সরসঙ্ঘচালক প্রণাম' জানানো হলো।

পরম পূজনীয় সুদর্শনজী সরসঙ্ঘচালক হিসাবে কলকাতায় এসেছেন। শহীদ মিনারে স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের সমাবেশে তাঁকে সরসঙ্ঘচালক প্রণাম দেওয়া হবে। শহীদ মিনার ময়দান কাণায় কাণায় পূর্ণ। আমরা সাংবাদিকদের বসার জন্য ৫০টা চেয়ারের ব্যবস্থা করেছিলাম। কার্যক্রমের শুরুতে ৫-৭ জন সাংবাদিক বসে ছিলেন। পরমপূজনীয় সুদর্শনজী বাংলায় ভাষণ শুরু করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে ময়দান সংলগ্ন প্রেস ক্লাব থেকে দলে দলে সাংবাদিক আসতে লাগলেন। আমরা বাড়তি চেয়ারের ব্যবস্থা করলাম। প্রায় ৭০-৮০ জন সাংবাদিক শেষপর্যন্ত এসেছিলেন। তাঁদের মন্তব্য— সর্বভারতীয় অবাঙালী কোনও নেতা বাংলায় অনর্গল ভাষণ দিচ্ছেন, এটা আমাদের কাছে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা।

স্বস্তিকার দফতরে খোশ মেজাজে সুদর্শনজী ২০১০ সালের জানুয়ারিতে।

পরমপূজনীয় সুদর্শনজী সরসঙ্ঘচালক থাকাকালীন দমদম বিমান বন্দরে তাঁকে আনতে গিয়েছি। একটা গাড়িতে তাঁকে নিয়ে আমি কলকাতার কার্যালয় 'কেশব ভবনে'র দিকে রওনা হই। দ্বিতীয় গাড়িতে তাঁর আপ্ত সহায়ক প্রদীপ যোশীজী ও অন্যান্য কার্যকর্তারা মালপত্র নিয়ে আসবেন। গাড়িতে আমি, সুদর্শনজী ও চালক কৃষ্ণ। বিমানবন্দর থেকে বাগুইহাটি পর্যন্ত আমরা চুপচাপ। হঠাৎ সুদর্শনজী বলে উঠলেন, জান রণেন, এই এখনই তোমার নাম আমার স্মরণে এল। তোমার নাম আমার মনে আসছিল না। আমি মনে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। এই এক ব্যাধি হয়েছে। আমি বললাম, ভাল ডাক্তার দেখান। উনি বললেন, ডাক্তার দেখছে।

২০০৭ সালের মার্চ মাসে নাগপুরে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক। প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনের পর

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরমপূজনীয় সুদর্শনজী। স্থান হাসনাবাদ, দিন ৩১ জানুয়ারি, ২০১১

চা-বিরতির সময় চা খেতে খেতে সুদর্শনজী আমাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। বললেন, একটা কথা আছে, চলো একটু ফাঁকা জায়গায় যাই। আমরা ভীড় ছেড়ে একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের দু'জনের হাতেই চায়ের পেয়ালা। সুদর্শনজী বললেন, দেখ রণেন, আমি সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব ছেড়ে দেব। আমার তো মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা। আমি বললাম, সেকি! আপনার শরীর স্বাস্থ্য ভাল, এখনই দায়িত্বমুক্ত হবেন কেন?

তিনি বললেন, আমার অ্যালজাইমার ব্যাধি হয়েছে, আমি কার্যকর্তাদের নাম ভুলে যাচ্ছি। আমি বললাম, আমেরিকা বা ভিয়েনা গিয়ে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে আসুন, দায়িত্ব ছাড়ার কথা ভাবছেন কেন? উনি বললেন, সব ডাক্তারদের বক্তব্য, এ রোগ বাড়বে বৈ কমবে না। কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। এইবার তুমি বল, পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক হিসাবে তোমার কাকে পছন্দ? আমি বললাম, আপনি যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন, তখন তো আমার বলার কিছু নেই। আমার মনে হয় মাননীয় মোহন ভাগবতজী পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক হিসাবে যোগ্যতম। তিনি বললেন, বাকি কার্যকর্তাদেরও একই মত।

বৈঠকের তৃতীয় দিনে তিনি ঘোষণা করলেন, 'স্বাস্থ্যের কারণে আমি সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলাম। আমি ২৫ জন প্রমুখ কার্যকর্তার সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তাঁরা আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকেই পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক হিসাবে মান্যবর মোহন ভাগবতের নাম করেছেন। এখন থেকে পরমপূজনীয় মোহন ভাগবত সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্বভার বহন করবেন।' তিনি শাল ও শ্রীফল দিয়ে বরণ করে মোহনজীকে সরসঙ্ঘচালকের আসনে বসিয়ে নিজে কার্যকর্তাদের মধ্যে এসে বসলেন।

একজন সর্বগুণান্বিত মানুষ দেশমাতৃকার চরণে সমর্পিত প্রাণ, নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনার মাধ্যমে ঋষিত্বে উপনীত হয়েছেন এই দৃশ্য আমি দেখেছি। আমি ধন্য, আমার মনুষ্যজীবন ধন্য। পরমপূজনীয় সুদর্শনজীর বৈকুণ্ঠগত আত্মার প্রতি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাই। ▯

(লেখক স্বস্তিকার প্রকাশক ও আর এস এসের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক)

পূজনীয় সুদর্শনজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুনীলপদ গোস্বামী

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।।

দীর্ঘদিনের অভিভাবক ছিলেন সুদর্শনজী। শিশুমন্দিরে রজত জয়ন্তী উৎসবে বিশেষভাবে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে সারাদিনে বিভিন্ন সংগঠনের কার্যক্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন।

অশান্ত আসাম, পাঞ্জাব সমস্যা ইত্যাদিতে তাঁর দেশব্যাপী ভ্রমণ এবং বৌদ্ধিক, মুশকিল হোত।

বাংলার খাওয়া বিশেষ পছন্দের ছিল। বেগুন ভাজা, মিষ্টি দই, সন্দেশ এবং চাটনী।

দেখা হলেই বলতেন, কেমন আছো। খোঁজ নিতেন সবার নাম ধরে। সেই

স্বস্তিকা-র ৬০ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে ১৯৯৮ সালে মহাজাতি সদনে সুদর্শনজী বক্তব্য রাখছেন। এছাড়াও রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, কালিদাস বসু, ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, তরুণ বিজয় ও সুবীর ভৌমিক।

কলকাতায় প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৭৭ সালে। ভবানীপুরের সঙ্ঘকার্যালয়ে একসঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। কলকাতায় এসেই শিখেছিলেন বাংলা ভাষা এবং আপন করে নিয়েছিলেন সবাইকে। ২০০৩-এ শহীদমিনার ময়দানে মাননীয় সর- সঙ্ঘচালকজী হিসাবে যখন ভাষণ দিতে শুরু করলেন, তখন বাংলার সাংবাদিকরা অবাক হয়ে শুনছিলেন তাঁর ভাষণ। শুধু বাংলায় বলছিলেন। পরেরদিন প্রত্যেক দৈনিক কাগজে বড় বড় হরফে তার প্রশংসা।

তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আন্দামান-নিকোবরে সঙ্ঘের কাজ শুরু হয়েছিল। অনেকবার গিয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু স্বয়ংসেবকদের অনুপ্রাণিত করেছে।

অনেক ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন। দক্ষিণের, উত্তরের অথবা পূর্বের কোনক্ষেত্রের লোক যে তিনি ছিলেন বোঝা অভিভাবককে হারালাম। ধন্য তাঁর জীবন ধন্য মাতৃসেবায় নিয়োজিত তাঁর প্রাণ।

(লেখক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সমিতির সদস্য)

সংশোধনী

(১) গত ২৪ সেপ্টেম্বর স্বস্তিকায় ‘সুদর্শনজী প্রয়াত’ শীর্ষক প্রতিবেদনে মুদ্রণপ্রমাদ বশতঃ ২০১০ সালে ১০ মার্চ অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে সুদর্শনজীর নাম সরসঙ্ঘচালক হিসেবে ঘোষণার কথা ছাপা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ২০০০ সালের ১০ মার্চ তাঁকে ‘সরসঙ্ঘচালক’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। (২) ওই সংখ্যাতেই দেবব্রত চৌধুরীর ‘দলে হিরো-দেশে জিরো’ (পৃ. ৩৬) শীর্ষক নিবন্ধে রাহুল গান্ধীর জন্মসাল ছাপার ভুলে ১৯৯০ হয়েছে, তা ১৯৭০ হবে। (৩) গত ১৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ‘অন্যরকম’ কলামে অনবধানবশত লালা হরদয়ালকে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপের মূল পাণ্ডা বলা হয়েছে। আসলে এর পরিকল্পনা ছিল রাসবিহারী বসুর, আর বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলেন বসন্ত বিশ্বাস। উপরোক্ত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। —সঃ স্বঃ

আমার দেখা পরমপূজ্য সুদর্শনজী

বাসুদেব পাল

একটি অনবদ্য মুহূর্ত : ২০১০ সালের ২৩ জানুয়ারি, কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে মোহনরাও ভাগবতের সরসঙ্ঘচালক হওয়া উপলক্ষে 'সরসঙ্ঘচালক প্রণাম' কার্যক্রমে সুদর্শনজীর সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রাক্তন ক্ষেত্রসঙ্ঘচালক বর্তমানে প্রয়াত কালিদাস বসু। রয়েছেন প্রাক্তন ক্ষেত্রপ্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত ও ক্ষেত্রসঙ্ঘচালক অমল কুমার বসু।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সঙ্ঘজীবনে প্রথম যে সর্বভারতীয় সঙ্ঘ কার্যকর্তাকে দেখি তিনি সুদর্শনজী। সদ্য পরলোকগত নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক কুপ্পহল্লী সীতারামাইয়া সুদর্শন। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসের ৯-১০-১১ তারিখে, কল্যাণীর গয়েশপুর আমবাগানে তিনদিনের মুখ্যশিক্ষক ও তদূর্ধ্বস্তরের কার্যকর্তাদের শিবির। জানাই ছিল--- পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক (তৃতীয়) বালাসাহেব দেওরসজীর প্রবাস উপলক্ষে শিবির। শাখা স্তরের কার্যকর্তাদের বৈঠক। বিষয়— শাখার মুখ্যশিক্ষক কেমন হবেন। তখন আমি সবে বিস্তারক, একমাসও হয়নি। স্বয়ংসেবকও নতুন। সাহস করে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারছি না যিনি বৈঠক নিচ্ছেন তাঁর নাম কী? বৈঠকের পরে একজন বললেন, উনি পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র প্রচারক এবং অখিল ভারতীয় শারীরিক প্রমুখ শ্রদ্ধেয় সুদর্শনজী। তখন নাম জানতাম, তবে চাক্ষুষ করিনি। 'মুখ্যশিক্ষক-এর শাখা চালানো'— এরকম এক নীরস বিষয়কে সরস ও উপোভোগ্য করা বোধ হয় সুদর্শনজীর পক্ষেই সম্ভব। সেদিন তিনি দুটি উদাহরণ দিয়েছিলেন— (১) একটি শাখায় ছেলে মুখ্যশিক্ষক, বাবা স্বয়ংসেবক, সে সময়ে শাখায় দেরিতে এলে মুখ্যশিক্ষক বড় সঙ্ঘস্থানে কয়েকপাক দৌড়নোর ন্যূনতম শাস্তি দিতেন। ছেলে নির্দ্বিধায় বাবাকে দৌড়ানোর আজ্ঞা দিল। কারণ তিনি দেরি করে এসেছেন। দ্বিতীয় ঘটনা— এক শাখার দৈনিক গড় উপস্থিতি ২ তরুণ, ৩ বালক। মুখ্যশিক্ষককে একের পর এক অনেক বেশি উপস্থিতির টার্গেট দেওয়া হলো— জেলা কার্যবাহ, বিভাগ কার্যবাহ এবং পরে প্রান্ত কার্যবাহজী যাবেন। ৫০০ উপস্থিতি চাই। যথারীতি প্রান্ত কার্যবাহের উপস্থিতিতেও উপস্থিতির টার্গেট পূর্ণ হলো। সকলকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল সকলে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ আদর্শ বিরোধী রাজনীতি করেন। পরদিন আবার সেই পাঁচ উপস্থিতি। কিন্তু ওই মুখ্যশিক্ষক সবার সঙ্গে তাদের আপদে-বিপদে উপস্থিত থাকেন। সেজন্য তিনি বলাতে কারও পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে মনে হয় সুদর্শনজী একজন মুখ্যশিক্ষকের সমাজে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে সবার কাছের মানুষ হওয়ার কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। বৈঠকটা সম্ভবত ১২ মার্চ, ১৯৮০ সকাল বেলাকার হবে। পরে ১৯৮৭ সালে দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড়ে প্রচারক হিসেবে থাকতাম। তখন বন্ধুবর মৃণালকান্তি কর মহাকরণে চাকুরীরত। থাকতেন ৮৪নং আশুতোষ মুখার্জী রোডের সঙ্ঘকার্যালয়ে। ওঁর উপর সুদর্শনজীকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব বর্তেছিল। মৃণালদার মুখে শোনা একটা সামান্য ঘটনা। সুদর্শনজীর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ। ব্যস্ত অফিসটাইমে সুদর্শনজী দমদমে নেমেছেন। মৃণালদা আনতে গিয়েছেন। কাঁধে যথারীতি দুটো বইয়ের ভারী ব্যাগ। দমদম থেকে দুবারে বাস পালটে ভবানীপুর আসতে হবে। সাতপাঁচ ভেবে মৃণালদা ট্যাক্সি ভাড়া করলেন। সুদর্শনজী বলেছিলেন--- তুমি ট্যাক্সিতে যাও, আমি লাইনবাসে যাব। তখন মৃণালদার যা অবস্থা হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

বিজয়গড় থেকে মৃণালদার ডাকে মাঝে মাঝে 'মৈথিলি আশ্রম হোটেলে' মাছ-ভাত খেতে অথবা সিনেমা দেখতে ভবানীপুর কার্যালয়ে যেতাম। সুদর্শনজীর থেকে ভয়মিশ্রিত সম্মানীয় দূরত্ব বজায় রেখে চলতাম। রাত্রি বারোটায় দেখলাম পড়াশোনা করছেন। আবার ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে দেখলাম ব্যায়াম করছেন চারটা নাগাদ। বৌদ্ধিক বিভাগ ও বৌদ্ধিক ব্যবস্থাকে এক উচ্চ এবং ব্যবস্থিত স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

১৯৯০ সাল। সেবার প্রতিনিধি সভার বৈঠকে (মার্চ মাসে) ওঁর কেন্দ্র এবং দায়িত্ব পরিবর্তন হলো। বৌদ্ধিক প্রমুখ থেকে সহ-সরকার্যবাহ। কেন্দ্র কলকাতা থেকে নতুন দিল্লীর 'কেশবকুঞ্জ'। মার্চ বৈঠকের আগেই আমাকে একদিন বললেন, তোমার কর্মক্ষেত্র বিজয়গড়ে যাব মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে। তুমি দিন বলো। আমি অনেক ভেবেচিন্তে ৩১ মার্চ শনিবার ঠিক করলাম। সায়ম্ শাখা। এবং পরে তরুণ স্বয়ংসেবকদের সামনে বৌদ্ধিক বর্গ। ওঁর কথা শোনার পরই বিজয়গড় ফিরে সহ-নগর

কার্যবাহ অসীমদার বাড়ি থেকে ফোনে তৎকালীন মহানগর প্রচারক সুনীলদা এবং প্রান্ত প্রচারক শ্রীকৃষ্ণজীকে ফোনে সব বললাম। পরে বুঝলাম পরিবর্তন হচ্ছে জেনেই উনি বিজয়গড় শাখায় যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন।

কার্যক্রম বেশ ভালো হয়েছিল। শাখার মাঠে ছবি তুলেছিলাম— বেশ ভয়ে ভয়ে। রাত্রে সুভাষদার (সুভাষ আচার্য) বাড়িতে খাওয়া- দাওয়ার ছবি তুলতে আর সাহসে কুলোয়নি। সে দুঃখ ভোলবার নয়। শাখার পর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বৈঠক নিলেন নিবাসে। আর তারপর 'রূপনিকেতন' হলে প্রায় একশত স্বয়ংসেবকদের সামনে বৌদ্ধিকের কার্যক্রম।

২০০৫ সালের ঘটনা। ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসক বামফ্রন্ট বেশিরভাগ আসনে ব্যাপকভাবে জয়লাভ করল। দিল্লী থেকে নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রধান পর্যবেক্ষক হয়ে এসেছিলেন বিহার-ক্যাডারের আই এ এস আধিকারিক আফজল আমানুল্লা। তিনি দিল্লীতে ফিরে রিপোর্ট দিয়েছিলেন বামফ্রন্ট ৩৫ টি আসনই অনৈতিকভাবে জিতেছে। ২০০৫-এ মে-জুন নাগাদ কলকাতার একটি বাংলা দৈনিক (যার ২০০৪-এ শুরু)-এ সেই সংবাদ আফজল আমানুল্লার ছবিসহ প্রকাশিত হলো। ব্যাস, সঙ্গে ইংরেজী ও হিন্দীতে অনুবাদ করে দিল্লী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক অর্গানাইজার ও পাঞ্চজন্য (হিন্দী) পত্রিকায় পাঠালাম। কী মনে করে জেরক্স কপি পরম পূজনীয় সুদর্শনজীকে নাগপুরের ঠিকানায় পাঠালাম। কয়েকদিন বাদে সন্ধ্যায় স্বস্তিকা কার্যালয়ে ফোন এল। শ্রীকান্ত (স্বস্তিকা'র কর্মী) বলল— আপনার ফোন নাগপুর থেকে। চমকে গিয়ে ফোন ধরলাম— সুদর্শনজীর গলা। ''শোন, তোমার ইংরেজিতে ভুল আছে। অসুবিধে হলে কাউকে দিয়ে ঠিক করিয়ে নেবে। ভুল লিখবে না।'' পরের বছর ২০০৬-এ ছোটবোনের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পাঠালাম ওঁর নামে। যথারীতি স্বস্তিকার ঠিকানায় বাবাকে উনি বাংলায় নিজের হাতে চিঠি লিখেছেন। কুণ্ঠা সহকারে লিখেছেন— ''সঙ্ঘশিক্ষা বর্গের প্রবাসের জন্য আসতে পারছি না, শুভকাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক।''

২০০৮-এ মালদাতে উত্তরবঙ্গের কার্যক্রম। স্বয়ংসেবদের গণবেশে পথসঞ্চলন এবং নাগরিক সমাবেশ। পরে দুদিন কার্যকর্তা বৈঠক, ছাত্র সম্মেলন এবং প্রচারক বৈঠক। উত্তরবঙ্গের সব প্রচারকের পরিচয় হলো। আমার হলো না। মনে মনে একটু দুঃখ পেলাম। ছোটভাই জলপাইগুড়ি জেলা প্রচারক। ও পরিচয় দিতেই জিজ্ঞেস করলেন— অন্য দু'ভাই কী করে? তখন বুঝলাম আমাকেও ওঁর খেয়াল আছে। পরে আরও পরিষ্কার হলো। যখন উনি বললেন— ওটা তো পথসঞ্চলন ছিল না, মিছিল ছিল। বাসুদেব স্বস্তিকায় লিখবে দারুণ পথসঞ্চলন হয়েছে। তোমরাও নিশ্চিন্ত হবে। এরপর উত্তরবঙ্গে কোথায় স্বস্তিকার প্রচার কত তাও জিজ্ঞাসা করলেন। সবাইকে ধমক দিলেন--- সাত হাজার করতে হবে শিলিগুড়িতেই। তখনও ভাবিনি আর তিন মাসের মধ্যে উনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন। আরও দু-একটি কথা। উনি সরসঙ্ঘচালক হওয়ার আগেই সঙ্ঘের চারজন প্রমুখ কার্যকর্তা দীনেন দে, শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত, সুধাময় দত্ত এবং শুভঙ্কর চক্রবর্তী ত্রিপুরার কাঞ্চনছড়ায় কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাস থেকে অপহৃত হয়েছিলেন ১৯৯৯-এর ৬ আগস্ট। খৃস্টান উগ্রপন্থী দল এন এল এফ টি জঙ্গিরা বন্দুকের মুখে তাঁদের অপহরণ করেছিল। কেন্দ্রে ক্ষমতায় এন ডি এ। বাজপেয়ীজী প্রধানমন্ত্রী, আদবানীজী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সন্ত্রাসবাদীরা দু'কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবী করেছিল। মুক্তিপণ দিলেও ছাড়বে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাঁদেরকে মুক্ত করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দিল্লীতে সুদর্শনজী এবং মদনদাসজী কয়েকদফা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে দেখা করেছিলেন। ত্রিপুরার বামপন্থী সরকার কোনওরকম সাহায্য-সহযোগিতা করেনি।

২০০১-এ জুলাই মাস নাগাদ কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে কেশব ভবনে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো ওঁদের চারজনকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালা নামক স্থানে হত্যা করা হয়েছে। কেশব ভবনে জরুরি বৈঠক করে আবাসিকদের সব খবর জানিয়ে প্রান্ত সঙ্ঘচালক খোকাদা (জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী), প্রান্ত প্রচারক সুনীলদারা সবার বাড়ীতে এই দুঃসংবাদ দিতে গেলেন। হঠাৎ শুনলাম পরম পূজ্য সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজীও আসছেন। উনি নিজে সবার বাড়িতে যাবেন। তিনি গিয়েছিলেন। বাড়ীর গুরুজনদের সঙ্গে দেখা করে সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানিয়ে এসেছিলেন। তখন ওঁর ডানহাত ভাঙ্গা। প্লাস্টার করা রয়েছে। সঙ্ঘ এক পারিবারিক সংগঠন। সরসঙ্ঘচালক সেই পরিবারের প্রধান। স্বয়ংসেবক-প্রচারক তাঁর আত্মার আত্মীয়। আমাদের সৌভাগ্য যে, এরকম এক মহাপুরুষের সান্নিধ্য ও মার্গদর্শন আমরা অনেকদিন পেয়েছি। এই যুগস্রষ্টা ঋষিকে শতকোটি প্রণাম জানাই। ▯

একটি বিরল মুহূর্ত : ১৯৯১ সালে দীপাবলী বৈঠকের ফাঁকে ফল কুটতে ব্যস্ত এইচ ভি শেষাদ্রিজী। রয়েছেন রজ্জু ভাইয়া (বাঁ দিকে চেয়ারে) ও সুদর্শনজী (ডানদিকে), সঙ্গে প্রচারক বাসুদেব পাল।

কলকাতায় প্রয়াত সুদর্শনজীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

বাসুদেব পাল॥ ‘‘প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সঙ্ঘজীবনে পরম পূজনীয় সুদর্শনজীর সাহচর্য পেয়ে নিজে ধন্য হয়েছি। দেখেছি একজন ব্যক্তি-মানুষ কীভাবে একজন ঋষিকল্প সন্ত-এ পরিণত হয়েছেন। দীর্ঘ সংসর্গের অনেক স্মৃতি অন্তরে ভরে আছে। অবাক হয়েছি যখন উনি ২০০৯-এর প্রতিনিধিসভার বৈঠকের আগে পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক কে হবেন তাও আলোচনা করেছিলেন। এরকম অনেক স্মৃতি আজ মনে আসছে।’’

এভাবেই পরলোকগত নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন পূর্বক্ষেত্র-সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পূর্বক্ষেত্রের প্রধান কার্যালয় কলকাতাস্থিত কেশব ভবনে তিনি প্রয়াত সুদর্শনজীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন। প্রাক্তন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী বলেন, সঙ্ঘ এক পারিবারিক সংগঠন। সেই পরিবারের প্রধান ছিলেন সুদর্শনজী। দীর্ঘদিন ক্ষেত্র প্রচারক, অখিল ভারতীয় শারীরিক প্রমুখ ও বৌদ্ধিক প্রমুখ থাকাকালীন কলকাতা তাঁর কেন্দ্র ছিল বারো বছরের বেশি। শ্রী চক্রবর্তী আরও বলেন, সরসঙ্ঘচালক শ্রী সুদর্শনজী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার জন্য তাঁরই পরামর্শে প্রান্তসঙ্ঘচালক হিসেবে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ‘প্রেস কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়া’-তে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তিনি। কলকাতায় তার শুনানী হয় এবং প্রেস কাউন্সিল আনন্দবাজার পত্রিকাকে ভর্ৎসনা করে কড়া ভাষায়।

বক্তব্য রাখছেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী ও শ্রীকৃষ্ণ মোতলোগ।

প্রবীণ বিজেপি নেতা যুগলকিশোর জৈথেলিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে সুদর্শনজীকে একজন বৌদ্ধিক যোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শ বা কথা বলতে কখনও পিছপা হননি। প্রবীণ সাংবাদিক এবং পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ অসীম কুমার মিত্র তাত্ত্বিক বিষয়ে সুদর্শনজীর কাছ থেকে উপকৃত হয়েছেন, তত্ত্বগতভাবে বিভিন্ন মতাদর্শের ভারত বিরোধী ও মানবতা বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রমাণ সাপেক্ষ তাত্ত্বিক লড়াই চালিয়েছেন সুদর্শনজী, তার বর্ণনা করেন। সুদর্শনজীর অগাধ পাণ্ডিত্য, বিস্তৃত পড়াশোনার উল্লেখ করেন বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা সহ। সঙ্ঘের ভবানীপুর কার্যালয়ে থাকাকালীন বরাবর সুদর্শনজীর ভোজন ব্যবস্থা ছিল প্রয়াত মহানগর সঙ্ঘচালক ডাঃ সুজিত ধরের বাড়িতে। ডাঃ ধরের ধর্মপত্নী এবং রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ক্ষেত্র কার্যবাহিকা শ্রীমতী মহুয়া ধর তাঁদের বাড়ির বিভিন্ন ঘটনা, সুদর্শনজীর আন্তরিক ও আত্মীয়তাপূর্ণ সম্বন্ধের উল্লেখ করেন। এমনকী তিনি তাঁর ছোট্ট মেয়েকে গল্প শুনিয়ে খাইয়ে দিয়েছেন। অকৃত্রিম আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল প্রয়াত সুদর্শনজীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, বহরমপুর বর্গ থেকে ফেরার পথে কনভয়ের গাড়ি হঠাৎ চলে আসা এক ফুলবিক্রেতাকে ধাক্কা দেয়। ব্রেক করার ফলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। কিন্তু সুদর্শনজী তাঁকে বলেছিলেন, ‘গরীব ফুলবিক্রেতাকে কিছু টাকা দিয়ে দাও’। এতটাই দরদী ছিলেন তিনি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিদ্যাভারতীর সত্যব্রত সিনহা প্রমুখ প্রবীণ কার্যকর্তারা। এছাড়াও স্মৃতিচারণ করে সুদর্শনজীর অকৃত্রিম স্নেহের কথার উল্লেখ করলেন কলকাতা মহানগর সহ-সঙ্ঘচালক সুশীল রায়। এদিনকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অশোক কর্মকার। সঙ্ঘের বিভিন্ন অধিকারী এবং অন্যা অনেক সংগঠনের পক্ষ থেকে সুদর্শনজীর প্রতিকৃতিতে মালা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

সুদর্শনজীকে শ্রদ্ধা নিবেদনে কলকাতার নাগরিক সমাজ।

চিঠিপত্র

মুসলিমদের করণীয়

ড. নজরুল ইসলামের সম্প্রতি প্রকাশিত 'মুসলিমদের করণীয়' বইটি ঘিরে আর একবার প্রমাণিত হলো, হিন্দুর শত্রু হিন্দুই। বইটি এখন পড়া হয়নি। তবে যেটুকু সংবাদে প্রকাশিত, তাতে স্পষ্ট— বইটি মুসলিম সমাজের প্রতি উস্কানি দিতে লেখা, প্রচ্ছন্নভাবে দাঙ্গায় প্ররোচনা দেয় এই ধরনের গ্রন্থ। '৪৬-এর 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' যথেষ্ট হয়নি, তাই আবার 'অ্যাকশনে'র ডাক দিয়েছেন এই 'কৃতী' বঙ্গ-সন্তান।

উল্লেখ থাক, বইটি প্রকাশনায় উৎসাহিত হয়েছে একটি হিন্দু প্রকাশন সংস্থা। বইটির প্রচুর প্রশংসা করেছেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মতে, এহেন গ্রন্থের প্রকাশ, প্রচার কাম্য। তাঁর কাছে অবশ্য এই আচরণ অভাবিক নয়। সময় এবং সুযোগ পেলেই হিন্দুধর্ম ও সমাজের মুণ্ডপাত করতে কিছুমাত্র দেরি করেন না। অবশ্য এই পথের তিনিই একমাত্র পথিক নন। যাঁরাই বুদ্ধিজীবী, কাগজে 'স্তম্ভ' লেখেন, গুরুগম্ভীর, সাজানো গোছানো সেমিনারে প্রধান অতিথি, সভাপতির পদ অলংকৃত করেন, তাঁদের জীবনচর্চার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই হিন্দুদূষণ। এক্ষেত্রে 'এপার ওপারের' কোন তফাত নেই। বরং ওপার বাংলার হিন্দু সমাজের বুদ্ধিজীবীরা মুসলিম প্রেমে এমন অন্ধ যে তাঁরা একটুও ভাবেন না, 'পাকিস্তান' গেছে, 'বাংলাদেশ'ও গেছে, অবশিষ্ট ভারত গেলে তাঁরা কোথায় দাঁড়িয়ে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ 'বক্তিমে' দেবেন!

—উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল, শেওড়াফুলি, হুগলি-৭১২২২৬।

শিরোনামে বারাসাত

পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলা। তার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণাও একটি। এই দেশের একটি শহর বারাসাত। ওই শহরকে বর্তমানে যদি বলা হয় নারীলোভীদের স্বর্গরাজ্য তাহলে মনে হয় ভুল বলা হবে না। ওইসব দুষ্কৃতকারীদের যাবতীয় আইন ও শাসনের বেড়াজাল থেকে শিখন্ডীর ন্যায় আড়াল করে রেখেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাসানুদাস পুলিশ পুঙ্গব।

পূর্বতন সরকারের ন্যায় ওই সরকারও প্রশাসন ও পুলিশকে দলদাসে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ বদল কিছুই হয়নি, শুধু পুরনো মদ নতুন বোতলে ঢুকেছে। ছিনতাই, ইভটিজিং, দাদাগিরি, তোলাবাজী, ধর্ষণ, খুন, জখম। দৈনিক সংবাদপত্রে এইসব খবরগুলি, পাতা আলো করা ওইসব সত্যসংবাদ প্রতিদিন পাঠক-এর গোচরে আসছে বলে ওঁর আবার গোঁসা হচ্ছে। উনি বলেছেন গুজবে কান দেবেন না অপপ্রচার করবেন না।

সুতরাং পশ্চিমবাংলার ১৯টি জেলার মধ্যে একটিমাত্র জেলার একটি শহরের বর্তমানে ছিনতাই রাহাজানি ও ধর্ষণকে দমন করতে যদি তিনি না পারেন, তাহলে আমরা কি ভাবতে পারি যার একটি শহরের ল এন্ড অর্ডার ঠিক করার ক্ষমতা নেই তিনি ১৯টি জেলাকে কিভাবে সামলাবেন?

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী।

সোমনাথ মন্দির

১৩ আগস্টের স্বস্তিকার 'ভাবনা-চিন্তা' বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধে শ্যামল কুমার হাতি বলেছেন, 'গান্ধীজীর পরামর্শে বল্লভভাই-এর তত্ত্বাবধানে সোমনাথ ট্রাস্ট গঠিত হয়েছিল। আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি সেই মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন।' সঠিকভাবে বলতে গেলে, কথাগুলিতে একটু ভুল আছে। ১৯৫০ সালের ৮ মে নবনগরের জাম সাহেব প্রস্তাবিত সোমনাথ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এক বৎসর পর, ১৯৫১ সালের ১১ মে রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক 'লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা' অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। ওই অনুষ্ঠানকে 'দ্বারোদ্ঘাটন' বলা চলে না। মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করতে আরও চৌদ্দ বৎসর সময় লেগেছিল। ১৯৬৫ সালের ১৩ মে শাস্ত্রীয় 'কলস প্রতিষ্ঠা' এবং 'ধ্বজ দণ্ড' অনুষ্ঠানাদি সমাপনের পর ২১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন ঘোষিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে সোমনাথ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নবনগরের জামসাহেব মন্দিরশিখরে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সরকারি উদ্যোগে সোমনাথ মন্দির পুনর্গঠনে পণ্ডিত নেহরুর প্রবল আপত্তি ছিল। 'লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা' অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির অংশগ্রহণেও তাঁর আপত্তি ছিল। গান্ধীজীর ওবিষয়ে কোনও আপত্তি ছিল না। সর্দার প্যাটেল যখন প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, গান্ধীজী সে সময় তাঁকে মন্দির পুনর্গঠনের কাজ। সরকারি কোষাগারের অর্থ ব্যয় না করে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত ২৪,৯২,০০০ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্মাণ সম্পর্ণ হয়েছিল। (সূত্র : 'Somanatha The Shrine Eternal', K. M. Munshi))।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০

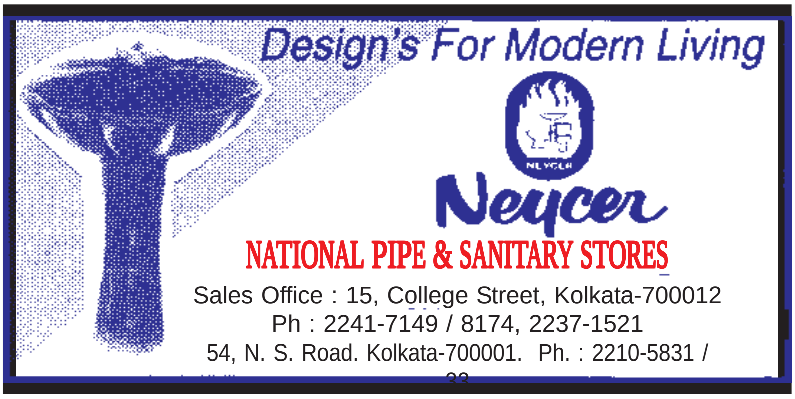

খাদের কিনারায় ভারতীয় অর্থনীতি

তারক সাহা

ইদানীংকালে ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে বহু চর্চা হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি লাগামহীনভাবে উর্ধ্বমুখী। সরকারের বা দেশের তাবড় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কোনওরকম হেলদোল নেই। বড় ধরনের কোনও আন্দোলন নেই এ নিয়ে। সীমাহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রায় খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

এমত অবস্থায় এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (এ ডি বি) জানিয়েছে যে ২০১২ আর্থিক বছরে আর্থিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে সাড়ে ছয় শতাংশের মতো। এ ডি বি এই স্লো ডাউন-এর জন্য দায়ী করেছে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং সেইসঙ্গে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়াকে। যার পরিণামে সঞ্চয় বা কোনও কিছুতে লগ্নী করার মতো পয়সা মানুষের হাতে নেই। চাহিদা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ শিল্পে ঘাটতি। গত দশকে আর্থিক গতি বৃদ্ধির সঙ্গে চাহিদা বেড়ে ছিল গাড়ি, গৃহ নির্মাণ সহ বিভিন্ন পরিষেবার বা সার্ভিস সেক্টরে। কিন্তু উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, বাণিজ্য ঘাটতি, বেড়ে যাওয়া সরকারি ব্যয় ইত্যাদি চাহিদা বৃদ্ধির পথে চরম প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে।

আর্থিক মন্দার এই ছোঁয়াচে রোগ কেবল ভারত বা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ যেমন চীন, জাপানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সীমানা ছাড়িয়ে তা ইউরোপেও প্রবেশ করেছে। ইউরো সংকট ২০১২-তে দুনিয়ার চাহিদাকে হ্রাস করিয়েছে। যার ফলে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক আগে এই উন্নয়ন হারকে ৬.৯ শতাংশে সূচিত করলেও চীন ও ভারতের আর্থিক মন্দা তা আরও টেনে নীচে নামিয়ে আনবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করেছেন।

সম্প্রতি স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর (এস অ্যান্ড পি) সংস্থাটি ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির হারকে নিম্নমুখী করে দেখিয়েছে।

এবিষয়ে আমাদের দেশের এক বাণিজ্যিক সংস্থা অ্যাসোচেম সতর্কবার্তা জানিয়েছে সরকারকে। এদের মতে 'বাণিজ্যিক ঘাটতি হয়ে চলেছে, রোজ তা স্ফীত হচ্ছে এবং পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছে তাতে ম্যাক্রো-ইকনমিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এখনই কড়া পদক্ষেপ করা দরকার।' এরই মধ্যে কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে ভারতীয় মুদ্রায় অনিশ্চয়তা এবং ডলারের তুলনায় অবাধ পতন। আত্মবিশ্বাসের পতন ঘটিয়ে ২০১২-য় মার্চ থেকে টাকার পতন ঘটেছে ১৩ শতাংশ এবং বর্তমানে ডলার পিছু টাকার দর দাঁড়িয়েছে ৫৭ টাকার কাছাকাছি।

আরেকটা দিক হলো কর্মসংস্থান। সমস্যাসঙ্কুল এই দেশে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের হ্রাস অবশ্যই আরেকটি বড় চিন্তার কারণ। গড়ে এদেশে কর্মসংস্থানের ঘাটতি এই অর্থবর্ষে ৩.৮ শতাংশ।

গত কয়েক বছরে শিল্পে ভারতের অবস্থান ছিল শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে বিশতম স্থানে। শিল্পে ক্রমাগত অধোগতির ফলে ওই স্থানটি আর নেই। এখন দেশে শিল্পের অবস্থানটা কীরকম? চালু অর্থবর্ষের (২০১২-১৩) এপ্রিল-মে মাসের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে গত বছরের তুলনায় ০.৮ শতাংশ কম।

বলা হয়ে থাকে, কৃষি ভারতের অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ। ভারতের অর্ধেকের বেশী মানুষ মূলত এই কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে। গ্রামীণ অর্থনীতি তো বটেই, ভারতের অর্থনীতিও এই সেক্টরের ওপর বিশেষ ভাবে জড়িত। দুনিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিম্নমুখী এই ক্ষেত্র আজ সংকটের মুখে। উন্নয়নের জেরে কৃষি জমির অধিগ্রহণ, সার সহ কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপকরণের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ লোকসানের সম্মুখীন। উৎসাহ হারাচ্ছে চাষী। দেনার দায়ে দেশজুড়ে কৃষকরা আত্মহত্যার সামিল। দেশের কৃষি দপ্তর বহুবিধ সমস্যাসঙ্কুল এবং এই ক্ষেত্রে সম্পর্কে যথেষ্ট উদাসীন। অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অতিরিক্ত আধুনিকীকরণেরও সমস্যা। আরেকটা উদ্বেগের কারণ মাত্রারিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার এবং মেশিনের ব্যবহার কৃষকদের ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তুলনামূলকভাবে শিল্পের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট মানুষরা দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে। ভিয়েতনামের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, সে দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ কৃষক চাষে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছে না এবং সাড়ে আঠাশ শতাংশ কৃষক বিদ্যুতের যেভাবে চাষে ব্যবহার করে ফসল ফলাতে হয় তার সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ পায়নি।

অর্থনীতির আরেকটা উদ্বেগের দিক হলো বাইরের ঋণ। ভারতের বাইরের পরিশোধ যোগ্য ঋণ যা এক বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে তার পরিমাণ সামগ্রিক ঋণের কুড়ি শতাংশ। ক্ষয়িষ্ণু বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডারে মজুত বিদেশী মুদ্রা দিয়ে হয়তো বৎসরকাল সমস্যার সমাধান করা যাবে। অর্থনীতির গগনে ঘনীভূত কালো বাদলের কোণেও রয়েছে রূপালী রেখার ঝলক। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুসারে এখনও চীন ও আমেরিকার পরে ভারত বিশ্বের তৃতীয় নম্বরে রয়েছে বিদেশী লগ্নীকারীদের পছন্দের তালিকায়। রাষ্ট্রসংঘের হিসেব মতো এই বছর এবং আগামী বছরে শেয়ার বাজারে কুড়ি শতাংশ লগ্নীর সম্ভাবনা রয়েছে। কমবেশী ১৭৯টি শিল্প, সার্ভিস এবং বুনিয়াদী সংস্থা এদেশে ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে তাদের লগ্নী নতুনভাবে করতে পারে অথবা লগ্নীর পরিমাণ বাড়াতে পারে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (এফ ডি আই) হাল কীরকম? দুনিয়াব্যাপী দেখা গেছে যে, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ২০১১ সালে গড় বিনিয়োগ বেড়েছে আর্থিক মন্দায় পূর্বের সময় থেকে। দুনিয়ায় আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও এর পরিমাণ ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের মতো। এই বছরের অনুমান ১.৬ ট্রিলিয়ন ডলার। ২০১১ সালে আমাদের দেশে লগ্নী এসেছে ৩২ মিলিয়ন ডলার।

মুডির হিসেব মতো যদি স্বাভাবিক বর্ষা, স্থিতিশীল ঘরোয়া মুদ্রাস্ফীতি এবং ধীরে ধীরে যদি বিশ্বে আর্থিক মন্দা কেটে যায় তবে দেশে আর্থিক উন্নতি সাত শতাংশের দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারে। এতগুলি 'যদি' কাটিয়ে মুডি-র আশা— দেশের আর্থিক উন্নতির রথের চাকা ঘুরে আট শতাংশে পৌঁছবে যদি সরকারি নীতি রূপায়ণে শৈথিল্য না আসে, যদি লগ্নীকারীরা এদেশে লগ্নীতে ইচ্ছুক থাকে তবেই। আবার সেই 'যদি'-র গেরোয় আটকে আর্থিক উন্নতির রথ। তবে ভর্তুকি না কমিয়ে সরকারি খাজনার বাড়তি অর্থের জোগান খুব শক্ত কাজ, আয় বাড়াতে হবে কর্পোরেট সেক্টর থেকে অধিকতর কর আদায় যা রাজকোষ ঘাটতি কমাবে। □

SATYANARAYAN ACADEMY

A Premier Institution run by the ex-students of Ramakrishna Mission

(A unique residential coeducational English Medium Secondary School)

Affiliated to CBSE (New Delhi - 2000)

Monthly Charge Rs. 3000/- Onwards with Fooding & Tuition etc. Girl will get 50% concession in tuition fee

Kolkata Address : 7B, Kiran Sankar Roy Road, 4th Floor, Kolkata - 700 001

For Further insertion contact - 9433175048 (M)

আসবাব

বর্ধমান

(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana
SAREES

Cotton Printed Sarees

Contact - 22188744/1386

গহনা যদি গড়াতে চান

যে কোনও স্বর্ণকারকে

সুপার

ক্যাটলগ দেখাতে বলুন

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স

১৫-ডি, গরাণহাটা স্ট্রীট, কলি-৬

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,

রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের

ফোল্ডিং ছাতা

বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,

ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE

স্টীলম এর ......

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে

Exclusive Show Room

দেওয়া হইবে॥

Factory :- 9732562101

উমা আসার খবর আনেন উপেন বৈরাগী

নবকুমার ভট্টাচার্য

শিশির ভেজা মাঠ, শিউলি ফুলের গন্ধ, নীল আকাশ, কাশফুলের বন জানিয়ে দিল শরৎ এসেছে। অর্থাৎ পুজো এলো। শরতে সত্যিকার পুজোর আনন্দ পেতে গেলে যেতে হবে গ্রামে। একসময় অবশ্য কলকাতার বাবুজনেরা পুজোর আনন্দ পেতে গ্রামেই যেতেন। গ্রামের পুজোর প্রতিমার এবং পুজোরও একটা সার্বিক চালচিত্র রয়েছে। সেই চিত্রটি বিশাল এবং একান্তভাবে প্রাকৃতিক। ভরা পুকুর, ফুটন্ত পদ্ম, শালুক, কাশবনের ব্যাপকতা, সবুজ শ্যামল আদিগন্ত ধানক্ষেত— এই চালচিত্রের মাঝে মা দুর্গার উজ্জ্বল রূপ কত সুন্দর মানায়, কত অলৌকিক করে তোলে। একি শহরে মেলে? শরতের প্রকৃতিই যেন দুর্গোৎসবের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এই শরতে যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই যেন দেখা যায় এক বিশাল পুজোর আয়োজন। দুর্গোৎসব ধর্মের নামে একটা কালচার মাত্র। তার সঙ্গে আস্তিকতা বা নাস্তিকতার কোনও বিরোধ নেই। কারও যদি ভাবের গভীরতা ও ভক্তি থাকে তো ভালই। মৃণ্ময়ী মূর্তির মধ্যে কেউ যদি চিন্ময়ীকে পেয়ে যান তার ভক্তি বা সাধনা সার্থক। তবে বাংলাদেশে ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেক বেশি প্রকাশ পায় মা দুর্গার প্রতি এক অপত্যস্নেহ ও ভালোবাসা। প্রবাসী মেয়ের বাপের বাড়ি আসা যেন। মায়ের মুখশ্রীতে যেন ফুটে উঠে এক অনির্বচনীয় প্রাণের স্পর্শ। ঢাক বাজবে বাইরে কিন্তু সেই ঢাকের শব্দ বাজবে বুকের মধ্যে। ভোরের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রায় অন্ধকারে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনতে পাওয়া যাবে টালির চালে টিপটিপে শিশিরের শব্দ আর শিউলির শব্দহীন পতনের কম্পন। প্রমোটার নামক অসুরদের উৎপাতে গ্রামে আর গ্রাম নেই এখন। দিন বদলে গেছে। মানুষ পাল্টে যাচ্ছে। মানুষের মুখের ভাষা, সাজসজ্জা, সামাজিক বিন্যাস আর আগের মতো নেই। চণ্ডীমণ্ডপ উধাও হয়ে যাচ্ছে। তবুও পুজো আসে। পুজোর নির্ঘণ্ট জানার অনেক পূর্বেই গাঁয়ের মানুষের মনে ঘটে যায় পুজোর উদ্বোধন। কারণ গ্রামে গ্রামে এখনও উমা আসার খবর আনেন উপেন বৈরাগী। উপেনকে দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়ার অনেকেই চেনেন। উপেনের গান শুনে মুগ্ধ হননি এমন লোক খুব কমই আছেন। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন থেকেই উপেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। সম্বল বলতে একটা ছোট হারমোনিয়াম আর কাঁধে একটা ঝোলা। উমা আসার খবর শোনান বাড়ি বাড়ি গিয়ে। এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম, এক জেলা থেকে অন্য জেলায়। উপেন শোনান— 'কবে যাবে এ গিরিরাজ আনিতে আমার উমাধনে। না হেরে সে মুখশশী আমি যে আর প্রাণে বাঁচিনে।' গান গেয়ে যা রোজগার হয় তাতে একটা মানুষের চলে যায়। উপেন গেয়ে চলে, 'আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে, সপ্তসিন্ধু কল্লোল রোল বেজেছে সপ্ত তারে।' উপেন বৈরাগীর বাড়ী ভগবানপুর। বাবা ব্রজ বৈরাগী গান গেয়েই দু'চার পয়সা রোজগার করতেন। আট ক্লাস পাস করা উপেন গ্রামের সখের অপেরা দলের গায়ক কাম পার্শ্ব অভিনেতা। তবু পুজোর গন্ধ এলেই বাবার শেখানো আগমনী গানের পসরা নিয়ে বেরিয়ে পরে উপেন। পুজোর পাঁচদিন বেশ কয়েকটি চণ্ডীমণ্ডপে আগমনী গান গাইতে হয় তাকে। মাইক ছাড়াই তার ভরাট কণ্ঠ গমগম করে পুজো প্যান্ডেলে। পনেরো থেকে আঠারোটা আগমনী গানের জন্য সে পায় পাঁচ থেকে আটশ' টাকা। এই পাঁচ দিনে তার রোজগার ঈর্ষা করার মতো। উপেন যে আগমনী গানটি খুব দরদ দিয়ে গায় অর্থাৎ শ্রোতাদের কাছে খুব হিট গান—

'এবার আমার উমা এলে
আর আমি পাঠাব না,
বলে বলবে লোকে মন্দ
কারু কথা শুনব না।
আমি শুনেছি নারদের মুখে
উমা আমার থাকে দুঃখে,
শিব শ্মশানে মশানে ঘোরে
ঘরের ভাবনা ভাবে না।
যদি আসেন মৃত্যুঞ্জয়
উমা নেবার কথা কয়,
তখন মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া
জামাই বলে মানবো না।'

উপেন তার বাবার কাছে শেখা আগমনী গানের পরম্পরা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। পুজো এলে এখনও দেখা মেলে উপেনদের। শহরে নয় গ্রামে। তবে এ পরম্পরা আর কতদিন? কারণ গ্রাম আর আগেকার সমাজ ও সময়ের ভেতরে বেঁচে নেই। ◻

পরম্পরা

চন্দননগরের বোড়াই চণ্ডী

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

হুগলি জেলার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ শহর চন্দননগর। পুণ্যতোয়া গঙ্গার পাশে অবস্থিত এই শহরের নাম নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কারও ধারণা চন্দনকাঠের প্রাচুর্যের জন্যই এক সময় এই নামে তা অভিহিত হয়েছিল। আবার 'মনসামঙ্গল' কাব্য-খ্যাত চাঁদ সদাগরের এই স্থলে বাণিজ্যসূত্রে আনাগোনার জন্যও হতে পারে এই নাম— এরকম ধারণা কেউ কেউ পোষণ করেন। তবে পুরাতাত্ত্বিক ড. রমারঞ্জন দাসের মতে, ফরাসিদের দেওয়া শাঁদেরনগর নামটি বাঙালি-মুখে হয় চন্দননগর। সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা না গেলেও, নামের বিভিন্নতা এই শহরের সুপ্রাচীনতাকে নির্দেশ করে। যদিও, অন্যান্য শহরের মতো এখানেও প্রাচীনতার নমুনা নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। তবু, যেসব নিদর্শন আজও এই শহরের বুকে টিকে আছে তার মধ্যে উল্লেখ্য মা বোড়াইচণ্ডীর মন্দির। দেবীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তি হলো, গঙ্গার তীরে স্থানীয় জেলে, মালা, ধীবর সম্প্রদায়ের দ্বারা পাতার কুটিরে চক্রচিহ্নযুক্ত শিলা পূজিত হতেন। স্থানের নামে দেবীর নাম বোড়াইচণ্ডী। দেবীর মাহাত্ম্যের কথা কেবল জেলে, মালা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই জনশ্রুতি মতে, মঙ্গলকাব্যের শ্রীমন্ত সদাগর বাণিজ্যযাত্রা কালে, বোড়াইচণ্ডীর পূজা দেন, দেবীর মন্দিরও গড়ে দেন। বর্তমান মন্দিরের গায়ে সে কথা খোদিতও আছে : শ্রীমন্ত সদাগর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী বোড়াইচণ্ডী মাতার মন্দির। কালের গ্রাসে সে মন্দির আজ বিলুপ্ত। বর্তমান জোড়বাংলা শৈলীর মন্দির ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযামে হাটখোলা ও তেলিনীপাড়ার জমিদারদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। ২৫ ফুট উচ্চতার মন্দিরের সামনে সমউচ্চতার নাটমন্দির।

মন্দিরের মধ্যে অষ্টধাতুর অতীব সুন্দর দেবীর বিগ্রহ। দেবী এখানে চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, তীক্ষ্ণনাসা, প্রধান দুটি চোখ আয়ত এবং উজ্জ্বল। দেবীর অঙ্গ জুড়ে বিবিধ অলংকার। মাথায় মুকুট, কানে দুল, গলায় চিক, সীতাহার, চার হাতেই চুড়ি, চুড়। দেবীর ডান দুই হাতে চক্র ও ত্রিশূল, আর বাঁ দিকের দুটি হাতে খড়গ ও শঙ্খ। 'চণ্ডী' অর্থ রুদ্রা বা ভয়ঙ্করী। কিন্তু দেবীর মুখমণ্ডল অতীব কোমল ভাবযুক্ত, মমতা মাখানো স্নিগ্ধ, সুন্দর। স-বস্ত্রা দেবীর চরণযুগল দৃশ্যগোচর হয় না।

দেবীর চোখ জুড়ানো বিগ্রহের মধ্যে আদি চক্রচিহ্নযুক্ত চণ্ডীশিলা বর্তমান, পূজারী বা সেবায়েত ছাড়া সেই চণ্ডীশিলা সাধারণ দর্শনার্থী দেখার সুযোগ পান না। যেমন, তারাপীঠে ব্রহ্মশিলা 'মুখোশ' মূর্তির অন্তরালে অবস্থান করছেন। সেখানে ব্রহ্মশিলা অবশ্য সাধারণ ব্যক্তি বিশেষ মুহূর্তে দেখতে পান।

চণ্ডীর সামনে মেঝেয় 'বুড়ো শিব'। মায়ের ভৈরব। কালো, খসখসে, চ্যাপ্টা পাথরের শিবলিঙ্গ। বুড়ো শিবের মাথাতেও মুকুট।

মন্দিরের অন্যতম সেবায়েত রীণা পলসাই (৫০) জানান, বোড়াই চণ্ডীর সবচেয়ে বড়ো উৎসব সম্পন্ন হয় চৈত্রমাসের নীলের গাজনে। সেই উৎসবে শিবের সঙ্গে দেবীর বিবাহ হয়। দেবী তখন ষোড়শী, লীলাবতী।

বাৎসরিক উৎসব ছাড়া বিশেষ পূজা, ভোগ-রাগ, সেবা সম্পন্ন হয় দুর্গাপূজার চারদিনে। বাইরে থেকে লোক সমাগম হয়। বাৎসরিক উৎসবে দূর-দূরান্তর থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন। বোড়াইচণ্ডীর এই অঞ্চলে জাগ্রত বলে বিশেষ খ্যাতি আছে। তাই শুধু বাৎসরিক উৎসবে বা দুর্গাপূজার চারদিনেই নয়, সারা বছরই বিশেষ করে শনি ও মঙ্গলবার বিভিন্ন সমস্যায় পীড়িত মানুষ মায়ের চরণে শরণ নিতে আসেন। □

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতু উপাখ্যান

কোতুর ঠাকুর্দা লাঠিয়াল ছিল

কোতুর ঠাকুর্দা ভালো লাঠি চালাতে পারত বলে সাতকড়ি রায় তাকে ঝাড়গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সাতকড়ির জমি একসঙ্গে ছিল কয়েক একর। একেবারে জলের দরে কিছু জমি কেনে। বাকি লাঠির জোরে। দশাসই চেহারা ছিল সাতকড়ির। সাড়ে ছ-ফুট লম্বা। পেটানো শরীর। দারুণ সাহস। ঝাড়গ্রামে জমির সঙ্গে ছিল দোতলা বাড়ি পুকুর। ফুল চাষের ব্যবসা ছিল সাতকড়ির। নিজে লাঠি চালাতে ভালো পারত। কিন্তু একা একা কি সব সামলানো যায়! কখন কোন সময় কোন দিক থেকে বিপদ আসে কে জানে।

কোতুর ঠাকুর্দার নাম ছিল হীরেন। ঝাড়গ্রামের জমি অন্যরকম। একেবারে ছবির মতো চারপাশ। সাতকড়ি রায়দের মতো ফুলচাষীরা জায়গাটাকে যেন সাজিয়ে রেখেছিল। কতরকম ফুল। যত্ন সবসময়। গাছগুলোর সঙ্গে যেন কথা বলত সাতকড়ি। ফুল চাষের জন্যে পড়াশোনা করত। অনেকরকম বই ছিল বসার ঘরের আলমারিতে। নিয়মিত পড়ত। মাঝেমাঝেই ডাকে বই আসত। তার মানে অর্ডার দিয়ে আনাত। বাগান দেখতে আসত অনেকে। তবে গাছে হাত দেওয়া বারণ ছিল। নিষেধ না শুনে কেউ কেউ গাছে হাত দিত। সাতকড়ির নজরে পড়ে যেত। শুনতে হোত তখন কিছু কঠিন বাক্য। একবার কয়েকজন মহিলা নানারকম ফুল দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। প্রাণভরে ছিঁড়েছিল একটার পর একটা। সাতকড়ি একসময় এসে দাঁড়ালো। বলল, 'মায়েরা, ফুল ভালোবাসা আর ফুলের ওপর অত্যাচার করা এক নয়। ফুল দেখে তোমাদের নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। হতেই পারে। এটা আমাকে বললে মালিরা ফুল তুলে দিত। তোমরা যা গাছ থেকে ছিঁড়েছো তার থেকে বেশিই দিত। তোমরা তা না করে নিজেরা ছিঁড়েছো এমনভাবে যাতে গাছগুলোর ক্ষতি হয়েছে। তারা খুব কষ্ট পেয়েছে। মা-জননীরা এভাবে ফুলকে ভালোবাসা যায় না।' একটা কথাও বলতে পারেনি মহিলারা। সাতকড়ি বলেছিল, 'ফুলগুলো নিয়ে যাও। খুশিমনেই নাও। তবে আর কখনও কোথাও ওইভাবে ডাল থেকে ফুল ছিঁড়ো না। ফুলকে ভালোবাসতে শিখলে ফুল তোলাও শিখে নিতে পারবে।' কোতুর দাদু হীরেন দেখেছিল বিশাল চেহারার মানুষটি একটুও না রেগে বুঝিয়ে দিয়েছিল খুব জরুরি কথা সুন্দরভাবে।

কোনও কোনও দিন বিকেলে হীরেনকে বলত, 'লাঠি দুটো নিয়ে আয়।' একটা লাঠি হীরেনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলত 'তৈরি হ'। হীরেন পেরে উঠত না। ওইরকম ভাবে লাঠি ঘোরাতে কাউকে দেখেনি সে। সাতকড়ি যখন ঝাড়গ্রামে আসে তখন ডাকাতের ভয় ছিল সবসময়। ডাকাতরা নতুন আসা সাতকড়ি রায়ের ক্ষমতা ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি। সাতকড়ির লাঠিতে জব্দ হয়েছিল ডাকাতরা। দশ বারোজন লাঠিয়াল ডাকাতকে একা রুখে দিয়েছিল সাতকড়ি। কেউ কেউ বলাবলি করত, 'সাতকড়ি রায় নিজেও ডাকাত। একদিকে ফুলচাষী, অন্যদিকে ডাকাত। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।' সাতকড়ি কখনও ডাকাতদলে নাম লেখায়নি। লোকে বলতে কসুর করেনি। সাতকড়ি যখন জমি কেনে তখন আশপাশের জমিওয়ালারা জব্দ করতে চেয়েছিল। সে প্রথমে শান্তভাবে সব দেখে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। তার উপর হামলার ছক করছিল সচ্চিদানন্দ চৌধুরী দলপাকিয়ে।

ঝাড়গ্রাম স্টেশন থেকে একদিন সাইকেল চালিয়ে ফিরছিল বাড়িতে। সাতকড়িকে ঘিরে ফেলে জন দশবারো লাঠিয়াল। হঠাৎ হামলায় সে প্রথমে চমকে গেলেও সাইকেল তুলে ছুঁড়ে মারে দুই লাঠিয়ালের উপর। তাদের লাঠি কেড়ে নিয়ে দুহাতে দুটো লাঠি ঘোরাতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে সবকটা লাঠিয়াল কাবু। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ব্রজ মুখার্জি খবর দেন পুলিশে। লেঠেলরা বলে, 'সচ্চিদানন্দ চৌধুরী টাকা দিয়েছিল সাতকড়ি রায়কে মারার জন্যে।' পুলিশকেও টাকা দিয়েছিল সচ্চিদানন্দ। সেসময় পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল ছিলেন হরিসাধন ঘোষচৌধুরী। ব্রজ মুখার্জির বন্ধু। সচ্চিদানন্দ জব্দ হোক এটা চেয়েছিলেন ব্রজ। শেষে সচ্চিদানন্দর বউয়ের অনুরোধে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে রাজি হয় সাতকড়ি। সচ্চিদানন্দ বাগানে বেচে দেবে ঠিক করে। খদ্দের পায়নি। সাতকড়ি বলে, 'জমি কিনে নিচ্ছি। বাড়ি বিক্রি করবেন না। যখন ইচ্ছে হবে এসে থাকবেন।' সচ্চিদানন্দ শত্রুর কাছে এমন ব্যবহার আশা করেনি। আর কোনদিন বদলা নেওয়ার কথা ভাবেনি।

হোতু সব শুনে বলল, 'তোমার দাদু ছিল সাহসী লাঠিয়াল। আর তুমি হচ্ছো ভিতুর ডিম। তারা সামনাসামনি লড়ত। আর তুমি পেছন থেকে ঘা মারার মতলব আঁটায় ওস্তাদ।'

কোতু চুপচাপ কথাগুলো হজম করল। তারপর বলল, 'চিকলি কিছু আনবে না?'

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

স্কুলে বইয়ের প্রদর্শনী

পুজোর ছুটির আগে রিয়াদের স্কুলে বইয়ের প্রদর্শনী হয়েছে। কতরকম বই সাজানো থেকেছে। ঝকমকে বই। কোনও বইয়ের দাম একশো টাকার বেশি নয়। ইংরেজি বাংলা বই বেছে বেছে আনা হয়েছিল। ত্রিশটা টেবিলে বই ছিল প্রায় পাঁচ হাজার। ছোটোরা দেখে দেখে বই বেছে নেবে— এমনই ভাবা হয়েছিল। রিয়াকে মা দু'শো টাকা দিয়েছিল বই কেনার জন্যে। স্কুলের উঁচু ক্লাসের দিদিরা বই বেছে নিতে সাহায্য করছিল। তারা বইয়ের টেবিল সাজিয়ে রাখছিল। বিক্রির হিসেব রাখার কাজ ছিল একই সঙ্গে। রিয়া দু'শো টাকায় পেলো ছটা বই। বইগুলোয় যে দাম ছাপা হয়েছে তার থেকে কুড়ি শতাংশ ছাড় দিয়ে বই বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। সুন্দর কয়েকটা কার্ড দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখা 'বই রোজ পড়বই।' সুন্দর একটা ব্যাগে বই ভরে দেওয়া হয়েছিল। রিয়ার আনা বইগুলো দেখে মা বাবা দাদা দাদাই খুব খুশি।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. বিশ্ব খাদ্যদিবস কোন্ তারিখে?

২. সত্যজিৎ রায় কোন্ সালে 'ভারতরত্ন' পান?

৩. ভারতে প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন কোন গভর্নর জেনারেলের আমলে হয়?

৪. প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়? প্রথমে কি নাম ছিল?

৫. 'পশ্চিমঘাট পর্বতমালা' এখন কোন্ মর্যাদা পেয়েছে?

উত্তর : ১. ১৬ অক্টোবর। ২. ১৯৯২ সালে। ৩. লর্ড ডালহৌসি। ৪. কলকাতায়। হিন্দু কলেজ। ৫. ইউনেসকো এবছরে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্বের অন্যতম ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান হিসেবে।

ছোটোদের বলছি

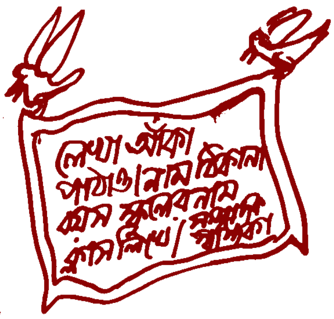

উলটো পালটা

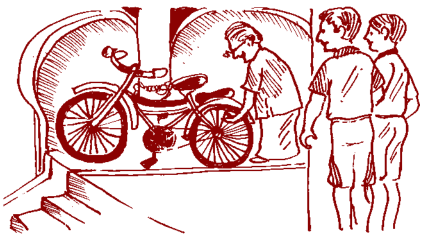

সপ্তর্ষিকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছে পিসেমশাই। সাইকেল চালিয়ে সে পড়তে যায়। মা কোনও কিছু দোকান থেকে এনে দিতে বললে নিয়ে আসে। বাড়ির একতলায় একটা রেলিং-এ সাইকেলটা বাঁধা থাকে। সপ্তর্ষির খুব পছন্দের সাইকেল। প্রায় রোজই দেখছে সাইকেলটার উপর কে যেন হামলা চালায়। চাকার হাওয়া খুলে দেয়। সপ্তর্ষি বেরোতে গিয়ে বিরক্ত হয়। বাড়িতে যারা থাকে তাদের বলেছে। কেউ স্বীকার করেনি, 'হাওয়া বের করে দিয়েছি।' সপ্তর্ষির পাড়ার বন্ধু অমিত বেশ ডাকাবুকো। সে বলল, 'তোর সাইকেলটা সরিয়ে তিনতলায় রেখে দে। আমার সাইকেলটা থাকবে।' একইরকম সাইকেল দুজনের। সিঁড়ির পাশে একটা জায়গায় লুকিয়ে রইল। একতলার বৃন্দাবন মুখার্জি নামে বৃদ্ধ মানুষটি চাকার হাওয়া খুলে দিল। সামনেরটা খুলে পেছনেরটাও খুলল। অমিত হাতেনাতে ধরল। সে মানতে রাজি নয়। অমিত বলল 'ঠিক আছে।' সেদিনই অফিস থেকে বৃন্দাবন ফেরার সময় গ্রিন পার্কের পুকুরে পড়ে গেল। অমিত ও লোকজন টেনে তোলে। পা ভেঙে গিয়েছিল। হাতেও আঘাত লাগে। বৃন্দাবনের বলার সাহস হয়নি, 'অমিত আমাকে ফেলে দিয়েছে।' অমিত বলেছিল সপ্তর্ষিকে, 'ছ'মাস নিশ্চিন্ত তুই। বৃন্দাবন এখন প্লাস্টার করা পা নিয়ে শুয়ে থাকবে।' সাইকেলের উপর হামলাও বন্ধ হয়ে গেল ওইদিন থেকে।

রামগরুড় সংকলিত

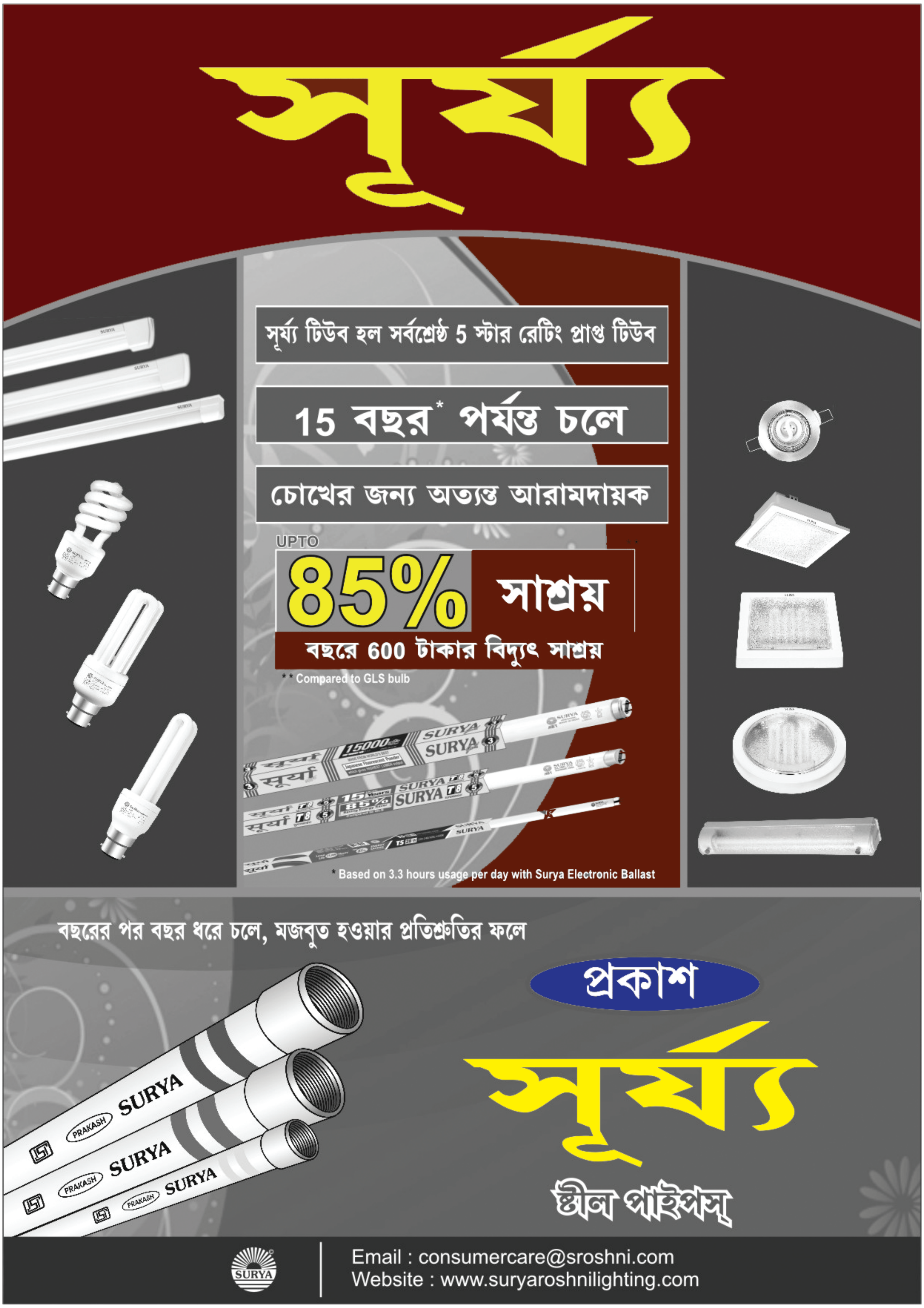

সূর্য্য
সূর্য্য টিউব হল সর্বশ্রেষ্ঠ 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত টিউব
15 বছর* পর্যন্ত চলে
চোখের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক
UPTO
85% সাশ্রয়
বছরে 600 টাকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়
** Compared to GLS bulb
* Based on 3.3 hours usage per day with Surya Electronic Ballast
বছরের পর বছর ধরে চলে, মজবুত হওয়ার প্রতিশ্রুতির ফলে
প্রকাশ
সূর্য্য
ষ্টীল পাইপস্
SURYA
Email : consumercare@sroshni.com
Website : www.suryaroshnilighting.com

ড্যানিয়েল ভেসেল্লা ও ভারতীয় ভাস্কর্য

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নক্ষত্র তিনি। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে সুইস ফার্মাসিউটিক্যাল গোষ্ঠী নোভার্টিস-এর চেয়ারম্যান ড্যানিয়েল ভাসেল্লাকে চেনেন না এমন মানুষ নেই। তিনি ভাস্কর্যপ্রেমী, এখবর তাঁর ঘনিষ্ঠদের জানা ছিল। কিন্তু তা দিয়ে তিনি ভারতবর্ষকে ঋণী করে রাখবেন এ খবর তাঁর আপনজনদের কাছেও ছিল না। না, তিনি নিজে ভাস্কর নন। তবে ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর একটা আলাদা টান ছিল বরাবরই। সেই সুবাদে বহু এদেশীয় অমূল্য ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পকাজ সংগ্রহ করা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করেছেন তাঁর সংগ্রহের আটশো'টি ভারতীয় ভাস্কর্য তিনি তুলে দেবেন মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ বাস্তু সংগ্রহশালায়। জানা গিয়েছে এই ভাস্কর্যগুলি ব্রোঞ্জের তৈরি। মূলত ১৯৩০ সালের পূর্বে এগুলি নির্মিত হয়। সেই অর্থে এগুলিকে খুব প্রাচীন ভাস্কর্য হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু ভাস্কর্যগুলির বিশেষত্ব মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে মুগ্ধ করেছে। তাঁরা ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছেন এই ভাস্কর্যগুলি এদেশে আনার জন্য কাস্টম শুল্ক প্রত্যাহার করার ব্যাপারে। মিউজিয়াম সূত্রেই জানা গিয়েছে, নোভার্টিসের চেয়ারম্যানই প্রথমে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলি ছত্রপতি সংগ্রহালয়কে দান করার

ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করে অবাক হয়ে যান যে ওগুলি এতদিন বেশ যত্নেই রেখেছিলেন ড্যানিয়েল। বলাই বাহুল্য, সরকারি মিউজিয়ামটির ট্রাস্টিরা ড্যানিয়েলের প্রস্তাবটি লুফে নেন। এই ব্যাপারে নোভার্টিসের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনাচক্রে ক্যান্সারের ওষুধের ব্যাপারে নোভার্টিস ভারতীয় পেশেন্ট ল' সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত, কাস্টম শুল্ক ছাড়ের যে কথা উঠেছে তা একমাত্র সম্ভব আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ওই ভাস্কর্যগুলির মূল্যায়ন এবং সার্টিফিকেট প্রদানের পরেই। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে এবং সংস্কৃতি মন্ত্রক উভয়ের সূত্রেই জানা গিয়েছে, এই প্রক্রিয়া চলছে। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ বাস্তু সংগ্রহালয়ে বহু দুর্লভ ভাস্কর্য শোভা পাচ্ছে। বিশ শতকের প্রথমের দিকে এই মিউজিয়ামটি নির্মিত হয়। পশ্চিম ভারতের ওয়ালেস মিউজিয়ামের রাজপুত্র বলেও একসময় পরিচিত ছিল এটি। ড্যানিয়েল ভেসেল্লার সংগ্রহ এই মিউজিয়ামকে সমৃদ্ধ নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু ততোধিক সমৃদ্ধ করবে এদেশের ভাস্কর্যকে। আর ভারতীয় ঐতিহাসিক উপাদান রক্ষার খাতিরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ড্যানিয়েল।

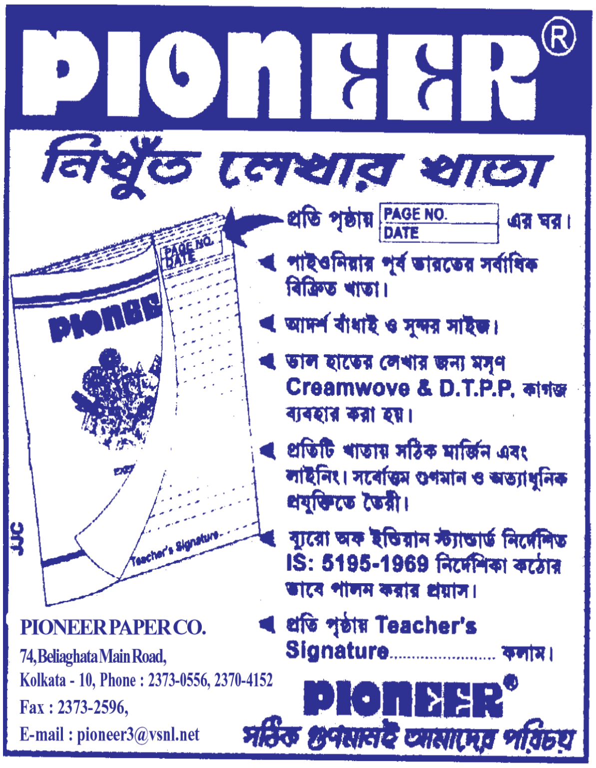

নেত্রদান মহাদান

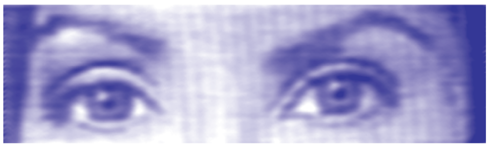

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931

Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

অতিথি কলম

ওয়াই এস গুরুমূর্তি

দেশের গোটা অর্থনীতিটাকেই বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত করার চক্রান্ত চলছে

ভারতবর্ষের খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ-এর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন ওয়ালমার্টের ডাইরেক্টর ১৯৯২ সাল পর্যন্ত; তারপর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিনটন; আর এখন ময়দানে নেমে গেছেন স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা। উদ্দেশ্য ভারতের বাজারে ঢোকানোর জন্য ওয়ালমার্টের ভিসা বাগানো, আর্থিক সংস্কারের জোয়ার আনার বাহানায় ওবামা স্পষ্টতঃই ভারতকে চাপ দিচ্ছেন ওয়ালমার্টকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। তার এই কুৎসিত নাক গলানোয় ভারত ব্যথিত। বিরোধী দল ক্ষুব্ধ। প্রধানমন্ত্রী যথারীতি নীরব। বাক্যবাগীশ ভারতীয় শিল্পপতিগণও নীরব। বীরাপ্পা মইলি আক্ষেপ করে বলেছেন, ‘‘ওবামাকে ঠিকমত তথ্য জানানো হয়নি’’। আনন্দ শর্মা আবার আমতা আমতা করে ভারতের নীতি নির্ধারণের স্বাধীনতার বড়াই করেছেন। কোনও কোনও সংবাদমাধ্যম তাদের সম্পাদকীয় কলমে নির্লজ্জের মতো ওবামা'র এই অবাঞ্ছিত নাক গলানোকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং এমনকী বড় বড় হরফে লেখা হয়েছে— ‘নয়া দিল্লীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে পঙ্গুত্ব হোয়াইট হাউস পর্যন্ত পৌঁছোল’। আসলে ঘুরিয়ে দেখলে বলা যেতে পারে— ‘হোয়াইট হাউসই বরং তাদের দুশ্চিন্তা নতুন দিল্লীতে পৌঁছে দিচ্ছে না কি?’

ওবামা

হিলারি ক্লিন্টন

মাইক ডিউক

খুচরো ব্যবসায় বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রশ্নটি নয়া দিল্লীর উপর চাপ হিসেবে দেখা দেওয়ার পিছনে কারা? ওয়ালমার্ট-পন্থীরা? হ্যাঁ, তবে তার চেয়েও গভীর কারণ ছিল এই যে ওবামা মার্কিন অর্থনীতির অধোগতি রুখতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। মার্কিন ও ইউরোপীয় অর্থনীতি মৌলিকভাবেই ছিল দুর্বল, কি পারিবারিক, কি ব্যাঙ্ক, সরকার কিংবা জাতীয় আর্থিক ক্ষমতার দিক দিয়ে, সব ক্ষেত্রেই ছিল ঘাটতি আর ঋণ। এইসব ঘাটতি পূরণ করতে দেদার ছাপানো হয় নোট— এটা আজ সকলেরই জানা। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কয়েকটি দেশের অর্থনীতি আজ কার্যত দেউলিয়া। মার্কিন অর্থনীতিও মৌলিকভাবে তাই, তবে এর সুসময়ে ডলারকে বিশ্ব অর্থনীতিতে ছড়িয়ে দেওয়ায়, অনেক দেশকেই আজ এর সঙ্গেই ডুবতে কিংবা ভাসতে হবে। ওবামা এবং তার উপদেষ্টাদের কাছেও তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বেড়ে ওঠা তাদের এই ব্যাধির হাত থেকে মুক্তির উপায় জানা নেই। ২০১০-এর পর থেকে মার্কিন অর্থনীতির উত্থানের যে প্রচার করা হচ্ছে তা আসলে মার্কিন সরকারের নেওয়া ৪২ লক্ষ কোটি ডলারের অতিরিক্ত ঋণ নিয়ে দরকষাকষির মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। ২০১১-র অবসাদের চিহ্ন, ২০১২-তে পতনের ভীতিতে পরিণত হয়। ২০১১-র সেপ্টেম্বরে, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আই এম এফ) মার্কিন আর্থিক অগ্রগতি ২.৫ শতাংশ থেকে নামিয়ে আনে ১.৫ শতাংশ; আর ২০১২-তে তা ২.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে করে ১.৮ শতাংশ। সম্প্রতি, মার্কিন সেন্ট্রাল বাজেট অফিস (সি বি ও) মার্কিন অর্থনীতির যে বেহাল দশার ভবিষ্যৎ ছবি প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৯-এর মধ্যে মার্কিন ঘাটতি পৌঁছে যাবে ৬৩.৫ লক্ষ কোটি ডলারে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ঋণ ২০০৮ ও ২০১১-তে যা ছিল যথাক্রমে ৭০ লক্ষ কোটি ডলার ও ১০৫.৫ লক্ষ কোটি ডলার, সেটাই ২০১২-তে হয়ে যাবে ১১২.৭ লক্ষ কোটি ডলার। এটাই শেষ নয়। মার্কিন উপভোক্তা ঋণও বাড়ছে। আবার উপভোগও কমছে। ২০১০-এ যা ছিল ৭১ শতাংশের উর্ধ্বে, ২০১১-য় তা নেমে যায় ৭১ শতাংশের নীচে এবং তা কমে ২০১২-র এপ্রিলে হয়েছে ৩.৭ শতাংশ। মার্কিনীদের প্রয়োজন সঞ্চয় এবং উপভোগ দুটোই বাড়ানো— যেমন গ্রীষ্মের পরেই আসে শীত পালা করে।

এটা বুঝতে অসুবিধা নেই যে ওবামা তার বাজার তৈরি করার সহজ পথগুলোকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। মার্কিন আর্থিক চিন্তাবিদগণ এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা তাদের শিষ্যরা ভালো করেই জানে যে উঠতি অর্থনীতি শক্তিগুলি যদি ঠিক থাকে, তাহলে মার্কিন বাজারের আগ্রহ ও ব্যবসায়িক নিশ্চিন্তিও বাড়বে। তবে চীন যদি আমেরিকায় বেশি পণ্য রপ্তানী করে ভালো থাকে তাহলে তা কিন্তু

আমেরিকার পক্ষে ভাল হবে না। আবার, মার্কিন নাগরিকগণ যদি বেশি ভোগ শুরু করে, তাতে বাজারও চড়বে এবং বাণিজ্যেও আগ্রহ বাড়বে কিন্তু তা পরিবার এবং ব্যাঙ্ক ব্যালান্সসিটে ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। তথাপি ভেন্টিলেটারে থাকা ওবামা প্রশাসন স্থিরভাবে বিশ্বাস করে যে ভারত তার খুচরো ব্যবসার দ্বার বিদেশী পুঁজির জন্য খুলে দিলেই মার্কিন বাজার আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠবে। ওয়ালমার্ট ভারতে দোকান খুললে আমেরিকায় কিছু বাড়তি কর্মী নিযুক্তি হবে এমনটাই ওবামা তার ভোটারদের বলছে এবং ভারতে খুচরো ব্যবসায় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ট্রফি নিয়ে আসার প্রতিশ্রতিও দিচ্ছে। হয়তো একটি কাজও জুটবে না, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিটাই Dow Jones Stock index বাড়িয়ে তুলবে। আর পুনরায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ওবামার এটাই লাভ।

ওবামা'র এই নাক গলানোর পিছনে কারণ আছে। ২০১০-এর শেষ দিকে ওবামা'র ভারতে আসার পূর্বে একবার ওয়ালমার্টকে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তার ভারত ভ্রমণের আগে ভারত সরকার, ভারতীয় শিল্প উদ্যোগ ও ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের উপরে মার্কিন সরকার, মার্কিন শিল্প উদ্যোগ ও মার্কিন প্রচার মাধ্যম চাপ সৃষ্টি করেছিল ওয়ালমার্টকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ওবামা আসার আগে ওয়ালমার্টের প্রধান মাইক ডিউক ভারতে এসে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে গেছেন। এদেশে তাদের ব্যবসায়িক প্রবেশে আশা ব্যক্তও করে গেছেন। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী ও প্রচার মাধ্যমগুলির ডিউকের ভারত সেবার বাণী প্রচার, ভারতীয় কৃষকদের জন্য অশ্রুপাত এবং গ্রামীণ ফসল ক্রয়কারী ছোট ছোট দেশীয় ব্যাপারীরা কিভাবে কৃষকদের ঠকাচ্ছে তার কল্পিত কাহিনী প্রচার। তবে আইন পাশ করার সময় ছিল খুবই অল্প। এই লবিওয়ালারা রেকর্ড তৈরি করতে করতে চলে যায় জুলাই, ২০১১। ২৪ নভেম্বর, ২০১১ প্রধানমন্ত্রী খুচরো ব্যবসায় আমেরিকা ও ওয়ালমার্টদের উল্লাস স্থায়ী হয়নি। দেশীয় খুচরো ব্যাপারীরা প্রতিবাদে ধর্মঘটে নামে। সমস্ত বিরোধী দল তাদের সমর্থনে নামে। সরকার তার ঘোষণা বদল করবে না বলেই একগুঁয়েমি করে। মোক্ষম আঘাতটি আসে ইউ পি এ জোট থেকেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখে। সাফল্যের হাসি এইভাবে মিলিয়ে যায়। এইবার দেখুন কিভাবে

ওবামা প্রশাসন স্থিরভাবে বিশ্বাস করে যে ভারত তার খুচরো ব্যবসার দ্বার বিদেশী পুঁজির জন্য খুলে দিলেই মার্কিন বাজার আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠবে। ওয়ালমার্ট ভারতে দোকান খুললে আমেরিকায় কিছু বাড়তি কর্মী নিযুক্তি হবে এমনটাই ওবামা তার ভোটারদের বলছে এবং ভারতে খুচরো ব্যবসায় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ট্রফি নিয়ে আসার প্রতিশ্রতিও দিচ্ছে।

আমেরিকা এবং ওয়ালমার্টের পক্ষের শক্তিশালী লবিগুলি ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আঘাত হানছে।

প্রথমেই দেখুন কীভাবে আমাদের মুদ্রা 'রুপিকে' গত ফেব্রুয়ারিতে ডলার প্রতি ৪৮-৪৯ টাকা থেকে নামিয়ে মে-জুলাই-এ নামিয়ে এনেছে ৫৫-৫৭ টাকাতে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলছে টাকার এই পতন কখনই স্বাভাবিক নয়। ভবিষ্যত ডলার সরবরাহের উপর মার্চ, ২০১২-এ তা বেড়ে হয় ১১ শতাংশ। এর ফলে বাজারে ডলার কেনা'র হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ফলস্বরূপ ডলারের দাম বেড়ে যায় আর টাকার দাম কমে যায়। টাকার এই পতন ভারতীয় অর্থনীতিতে চাপসৃষ্টি করে— বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার কমতে থাকে এবং তেলের দামও বাড়তে থাকে। এই সুযোগে ওয়ালমার্ট লবি আর্থিক সংস্কারের ধুয়ো তোলে। ভারতে সংস্কার বলতে বোঝানো হয় কেবল অর্থনীতিকে বিদেশী পুঁজির কাছে খুলে দেওয়া, বিশেষ করে খুচরো ব্যবসা। প্রচার মাধ্যম ও ব্যবসায়ী লবি ভারতীয় কৃষকদের বাঁচাতে ওয়ালমার্টের গুণকীর্তন করছে। আজ এই সকলকেই পেয়ে বসেছে যে এই চাপের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সরকার শুধু খুচরো ব্যবসা নয়, সমস্ত অর্থনীতিকেই বিদেশীদের কাজে উন্মুক্ত করে দিতে পারে। ওবামার এই নাক গলানোর ফলেই সব কিছু ওলোটপালট হয়ে গেছে। এই ঘটনার কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় মনমোহন সিংজীর ইউ পি এ জোট সরকারের পক্ষে তখন আর ওয়ালমার্টকে আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব নয়। এই সরকার যদি এমন দেশের খুচরো ব্যবসা বিদেশী পুঁজির হাতে তুলে দেয় তবে তা ওবামাকে খুশি করতেই করা হবে। আজ এটা ইন্দো-মার্কিন সম্পর্কের ইতিহাসকেই সামনে নিয়ে এসেছে। বহু দশক ধরেই ভারতীয় মানসে আমেরিকা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব ছিলই। দীর্ঘলালিত এই বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছিল সেই ঠাণ্ডা-যুদ্ধের সময় থেকেই যখন তারা ভারতকে জব্দ করতে পাকিস্তানকে তোল্লা দিয়েছিল। এখনও সেই অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন তো হয়নি, উল্টে আমেরিকাই পাকিস্তানের অত্যাচারের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। এই ইতিহাস হয়তো ওবামার অজানা, তাই এই ভুল করেছে। তার এই নাক গলানোয় মার্কিন কু-মতলব সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই আজ উঠে আসছে।

*'**Swadeshi Patrika**'-র আগস্ট ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত।*

এস গুরুমূর্তি একজন খ্যাতনামা আর্থ-রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও ভাষ্যকার।

FOR INTERIORS
THAT EVOKE ADMIRATION
For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.
CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…
CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...
CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…
Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM
CENTURYPLY®

দূষণের কবলে পবিত্র গঙ্গা

ডঃ প্রবীর রঞ্জন শূর

জল ব্যতীত জীবজগৎ প্রাণহীন। প্রাণী অথবা উদ্ভিদ উভয়েরই জলছাড়া চলবে না। ছোট ছোট কীটপতঙ্গও বেঁচে থাকে জলের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ শেকড় দিয়ে জল শোষণ করে। সেই জল কাণ্ড, পাতায় বাহিত হয়। আর ছোট ছোট পোকামাকড় গাছের ডালের বা পাতার সেই জল নানা প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। প্রতিটি মানুষের প্রত্যহ জলের নানা প্রয়োজন ছাড়াও অন্তত ১ থেকে ২ লিটার শরীরে পানীয় জলের প্রয়োজন হয়। আর সেই জলকে আমরা দূষণের কবলে ফেলছি।

এই দূষণের অভিশাপ থেকে আমাদের অতি পবিত্র 'গঙ্গা'কেও মানুষ নিষ্কৃতি দেয়নি। 'গঙ্গা' ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় নদী, সাধারণভাবে ভারতবাসী এবং বিশেষ ভাবে হিন্দুদের কাছে গঙ্গার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় গুরুত্ব সীমাহীন। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪০ ভাগ জনসংখ্যাযুক্ত ১১টি প্রদেশের ভিতর দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে।

গঙ্গার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০৬ কিলোমিটার বা ১৫৫৭ মাইল। এর উপত্যকা অঞ্চল চার লক্ষ বর্গমাইল। এর উৎপত্তি হিমালয়ের দক্ষিণে গঙ্গোত্রী হিমবাহে। সেটি সমতলভূমি থেকে প্রায় ১৪০০০ ফুট উচ্চতায়। গঙ্গা ঋষিকেশ, হরিদ্বার, বারাণসী এবং প্রয়াগ বা এলাহাবাদ তীর্থক্ষেত্র দিয়ে বাহিত হয়েছে। সংস্কৃত, হিন্দি এবং বাংলায় 'গঙ্গা' নামেই অভিহিত। তামিল ভাষায় গঙ্কাই বলে। একে 'মা' হিসাবে সর্বত্রই পূজা করা হয়। হিন্দুদের কাছে গঙ্গা অতি পবিত্র। গঙ্গাস্নানে সব পাপ দূর হয় বলে বিশ্বাস।

এহেন পবিত্র গঙ্গার জল আজ দূষণে অপবিত্র। এই গঙ্গার জল বাড়িতে বছরভর পাত্রে রেখে দেওয়া যেত। এতে কোনও জীবাণু দেখা যেত না। কিন্তু বর্তমানে জল বেশিদিন রাখা যায় না। জলে নানা ধরনের জীবাণু জন্ম নেয়। বৈজ্ঞানিকরা গবেষণায় দেখেছেন গঙ্গার জলে একপ্রকার ব্যাকটেরিওফাজ (ভাইরাস) থাকে, যারা গঙ্গা জলে যাবতীয় ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করে জলকে দূষণমুক্ত করতে সাহায্য করতো, কিন্তু বর্তমানে এতে দূষণের মাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে ওই উপকারী ভাইরাস (ব্যাকটেরিওফাজ) আর জলে বেঁচে থাকতে পারছে না। যার ফলে গঙ্গার জলে ব্যাকটেরিয়া সহ নানা দূষিত জীবাণু অতি সহজেই জলে দূষণ সৃষ্টি করছে।

দূষণের কারণ : গঙ্গার উপত্যকা অঞ্চল চার লক্ষ বর্গমাইল অতি উর্বর হওয়ায় ভারতে ১১৯টি শহরের মধ্যে ৫২টি শহর এই উপত্যকায় ঘন বসতি স্থাপন করেছে। শহরের প্রত্যেকটির কমপক্ষে ৫০ হাজার মানুষ প্রতিদিন ময়লা জলে ফেলছে। শুধু বারাণসী শহরে প্রতিদিন প্রায় ২.৯ বিলিয়ন লিটার মানুষের বর্জ্য পদার্থ এই গঙ্গায় মিশেছে। গঙ্গার দুইদিকে অসংখ্য কলকারখানা যেমন কাপড়ের কল, চটকল, রাসায়নিক কারখানা, চামড়ার কারখানা, হসপিটাল, পেট্রোকেমিক্যাল, সার, রবার ইত্যাদির বর্জ্য পদার্থ এসে পড়ে এই পবিত্র গঙ্গায়। তাছাড়া আছে হাজার হাজার পয়ঃপ্রণালীর নোংরা জল। ১৯৮৬ সালে ভারত সরকারের 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান'-এ কোটি কোটি টাকা খরচ করবার পর দেখা যাচ্ছে পুরো কর্মকাণ্ডটাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এতে গঙ্গা দূষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে যেসব নানা রাসায়নিক পদার্থ জলে মিশছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ফেনল'— যা জলের গন্ধ ও স্বাদের পরিবর্তন ঘটায়। 'সায়ানাইন'— যা রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর অক্সিজেন বহন ক্ষমতা হ্রাস করে। ডিটারজেন্ট জলে শৈবালের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় যারা রাত্রিবেলায় শ্বসনের মাধ্যমে জলের অক্সিজেন মাত্রা কমিয়ে দেয়। অ্যামোনিয়া সার জলের নীচে মাটিতে নাইট্রেটকে নাইট্রাইটে পরিণত করে যা কিনা হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস করে।

গঙ্গা দূষণ প্রসঙ্গে একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। আমার কর্মস্থল হাওড়ার ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে যাতায়াত করতাম গঙ্গার উপর দিয়ে লঞ্চে করে। বিচালি ঘাট থেকে নাজিরগঞ্জ পারাপারের সময় একদিন মেটিয়াবুরুজের কয়েকজন যুবক একটি মুখবন্ধ বস্তা নিয়ে লঞ্চে করে মাঝ গঙ্গায় এসে বস্তাটি জলে ফেলে দিল। জানা গেল বস্তার মধ্যে একটা জীবিত পাগলা কুকুর ছিল। নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পবিত্র গঙ্গার দূষণ এবং তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম।

'৬০-এর দশকে দেশে বিপ্লবের জন্য জমিতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার হয়েছিল। যার ফলে ওই কীটনাশক মাটি থেকে জলে দ্রবীভূত হয়ে গঙ্গায় মিশেছে। জল দূষণের ফলে মানুষের নানাবিধ অসুখ যেমন কলেরা, আমাশয়, আন্ত্রিক, জন্ডিস, বিবিধ চর্মরোগ এমন কি ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী জলবাহিত রোগে পৃথিবীতে বছরে ৩৪ লক্ষের বেশী মানুষ মারা যাচ্ছে। আর তৃতীয় বিশ্বে প্রতিদিন ২৫০০ মারা যাচ্ছে জলবাহিত রোগে।

সারা পৃথিবীতে জলের পরিমাণ ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার। এই জলের শতকরা ৯৭ ভাগ লবণাক্ত। অর্থাৎ ব্যবহারের অযোগ্য। অবশিষ্ট ৩ ভাগ জলের ২.৩১ ভাগ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে বরফ হয়ে জমে থাকে। অর্থাৎ মানুষের ব্যবহার্য জলের পরিমাণ বাড়ায় মাত্র ০.৬৯ ভাগ। বৈজ্ঞানিকদের মতে সামনে আর মাত্র ৮-১০ বৎসরের জন্য জল সংগৃহীত আছে। তার পরেই কিন্তু জলের সমস্যা প্রকট হবে। কারও কারও মতে সামনে 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ' হবে জল নিয়ে।

শ্রদ্ধেয় উমাভারতী পবিত্র গঙ্গা রক্ষার উদ্দেশ্যে এক পরিক্রমা আন্দোলন শুরু করছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা তাঁর এইপ্রচেষ্টা সার্থক হোক। আমাদের পবিত্র 'মা গঙ্গা' দূষণের কবল থেকে রক্ষা পান। ▯

বিশেষ নিবন্ধ

জাতীয় নদী হিসেবে ঘোষণা, অথচ গঙ্গার গঙ্গাযাত্রা হতে চলেছে

নবকুমার ভট্টাচার্য

ভারতের বুকে অনাদি অনন্তকাল ধরে পবিত্র জলধারার মতো বয়ে চলেছে গঙ্গা নদী। এই নদী ভারতের হৃদয়ের মতো। গঙ্গার অববাহিকার উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুঃ এক সময় বলেছিলেন, ভারতের সব নদীর মধ্যে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ নদী। ভারতের হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায় এর বুকে কান পাতলে। তাই তো সভ্যতার শুরু থেকে গঙ্গা নদীর কাছে ছুটে এসেছে অগণিত লক্ষ লক্ষ মানুষ। উৎস থেকে শুরু করে সাগর পর্যন্ত ধারার মধ্যে রয়েছে ভারতের কৃষি ও সভ্যতার কাহিনী। হয়তো একারণেই স্বাধীনতার এত বছর পরে হলেও গঙ্গাকে জাতীয় নদী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এক সময়ে যে নদীর দৌলতে গড়ে উঠেছিল দেশের গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যে নদীকে পতিতোদ্ধারিণী বলে বন্দনা করা হয়েছে সেই গঙ্গা ভবিষ্যতে একটি নোংরা দুর্গন্ধময় বৃহৎ নর্দমায় পরিণত হতে চলেছে। এখন আমরা যদি এই নদীর স্বাস্থ্য ফেরাবার ব্যাপারে সচেতন না হই তবে গঙ্গা পরিণত হবে ইতিহাসে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সমীক্ষক সংস্থা ডব্লু ডব্লু এফ-এর কনজারভেশন গ্রুপের পেশ করা রিপোর্টে বলা হয়েছে, গঙ্গাকে কেন্দ্র করে যে পরিমাণ দূষণ বেড়ে চলেছে, যেভাবে নির্বিচারে গঙ্গা থেকে জল তুলে নেওয়া হচ্ছে, উপনদী শাখানদী অবলুপ্তির দিকে চলছে— তাতে গঙ্গা পরিণত হবে এক মৌসুমী নদীতে। অর্থাৎ বর্ষার ঋতু ছাড়া বছরের অন্য সময় নদী শুকনো থাকবে। কিন্তু গঙ্গার এই বেহাল দশা কেন?

এই শতাব্দীর পরিবেশবিদ লেস্টার আর ব্রাউন সম্প্রতি সমীক্ষা করে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, যে দ্রুতহারে হিমালয়ের হিমবাহগুলি গলে যাচ্ছে সেই হার বজায় থাকলে ২০৩৫ সালের মধ্যেই সমগ্র হিমালয় থেকে সব হিমবাহের অস্তিত্ব মুছে যাবে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গার ৭৫ শতাংশ জল আসে। প্রতি বছর ১৭ মিটার দূরে সরে যাচ্ছে

অর্থাৎ শুকিয়ে যাচ্ছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। একই অবস্থা পিওরি হিমবাহেরও। এই হিমবাহটি ৯.৫ মিটার শুকিয়ে যাচ্ছে প্রতিবছর। সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডে ভাগীরথী গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মাণ করে গঙ্গার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। গঙ্গার চরিত্র মৌসুমী হয়ে গেলে শুখা মরসুমে চাষের জন্য নদীতে আর জল থাকবে না। ফলে গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলের কৃষি বিপন্ন হয়ে পড়বে। প্রায় ৪১ কোটি মানুষের পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেবে। যেহেতু ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই ভূগর্ভস্থ জলস্তর বিপজ্জনকভাবে নেমে যাচ্ছে সে কারণে গঙ্গার জল চাষের সময় না পেলে খাদ্যোৎপাদন ভীষণভাবে মার খাবে। এই নদীর উপর ভিত্তি করে দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বৈচিত্র্যময় কৃষিবিকাশের উপর দাঁড়িয়ে পল্লবিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। গঙ্গাধারায় প্রবাহিত প্রাকৃতিক পরিবেশ যা জল, হাওয়া, মাটি নিয়ে গড়ে উঠেছে সব শ্রেণীর কৃষিকে ব্যাপকতর অর্থে এক গভীর পূর্ণতা দান করেছে। তাই গঙ্গা বিপন্ন হলে কৃষিও বিপন্ন হতে বাধ্য। সমগ্র দেশের মোট সেচ সেবিত অঞ্চলের ৪০ শতাংশেরও বেশি অঞ্চল সেচের জন্য এই নদীর অববাহিকার জল ব্যবহার করে। এখন অবশ্য গঙ্গার বিশাল জলরাশির ধারা ক্রমশ অবক্ষয়ের দিকে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে যখন বৃষ্টির জলে নদী পুষ্ট হয় না। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, চাষ আবাদের জন্য জমিতে জলের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং উত্তোলিত জল সরবরাহ নদীকে ক্ষীণকায়া করে দিয়েছে। অসংখ্য জনপদ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যথেষ্ট জল আহরণ করে নিচ্ছে। এতেও মানুষের কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি। শিল্পসংস্থাগুলো বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ নদীর বুকে নির্বিচারে ঢেলে দিচ্ছে। দূষণ সমস্যার প্রেক্ষাপটে গঙ্গাজল আর বৈদিক যুগের মৃত পবিত্র ধারায় অভিষিক্ত নয়, গঙ্গা আজ অপবিত্র। গঙ্গা এখন আর পতিতোদ্ধারিণীর পঙ্কোদ্ধার করে কী? গঙ্গাজলের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেলেও পুণ্যের আশায় গঙ্গাস্নান কিন্তু বন্ধ হয়নি। কেবল প্রয়াগ ও হরিদ্বারে অমৃতের ছোঁয়া পাওয়ার জন্য প্রতি বারো বছর অন্তর কুম্ভমেলা উপলক্ষে আমরা যে পরিমাণ গঙ্গাকে দূষিত করি তার মার্জনা নেই। ১৯৮৯-তে কুম্ভমেলা উপলক্ষে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মাসখানেক এই মেলায় ২৫০ টন পায়খানা এবং ১০ লক্ষ টন লিটার মূত্র প্রতিদিন গঙ্গাতে মিশেছে।

স্বর্গীয় রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন গঙ্গা দূষণরোধ পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য ১৯৮৬ সালের জুন মাসে গঠন করেছিলেন Ganga Action Plan। এই প্রকল্পে প্রথম পর্যায়ে বেছে নেওয়া হয়েছিল

কিছু শহরকে যেখানে দূষণের মাত্রা খুব বেশি। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান-১ শুরু হওয়ার পর ১৯৯৩-তে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান-২-এর কাজ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে খরচ করা হয়েছিল ২৫০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে খরচ হয়েছে আরও কয়েক হাজার কোটি টাকা। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের কর্তৃপক্ষ একেবারে গোড়ায় জানিয়েছিলেন পনেরো বছরে এই কর্মযজ্ঞের সমাপ্তি হবে। কিন্তু ২০০5 সালে প্ল্যানিং কমিশনের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত শতকরা ৩৫ ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করলে জানা যাবে, গঙ্গানদীর বিশাল দৈর্ঘ্যের মাত্র ২৫০ কিলোমিটার পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের ৩০০ কোটি টাকা খরচ করা হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের হাইকোর্ট এ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ১৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটিকে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কলকারখানা থেকে মূলতঃ ডুমুরদহ থেকে বিড়লাপুর পর্যন্ত ৯২ কিলোমিটার অংশে নদীতীর বা নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ৯৬টি বৃহৎ শিল্প দ্বারা অপসারিত বর্জ্য এসে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গঙ্গার তীরে কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। সেসব তো বটেই। তার সঙ্গে আরও অনেক দূষিত পদার্থ বৃষ্টির জলে ধুয়ে বা নর্দমা বেয়ে নদীর জলে মিশছে।

হুগলী নদীর জলের দূষণমাত্রা পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালে পলতা জলশোধন কেন্দ্র থেকে জলের এক নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা গেছে পলতার কাছে গঙ্গার জলে মোট কোলিফরমের পরিমাণ সহনশীল মাত্রার ১৮৪ গুণ বেশি। অন্যান্য দূষণ কারণ তো আছেই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোলিফরমের মাত্রা। এর থেকে প্রমাণ হয় গঙ্গার জল স্নানের উপযুক্ত নয়। গঙ্গা হলো জীবনধারা। তাই জীবনপ্রবাহকে অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ রূপায়ণের।

এই পরিকল্পনার অর্থ হলো দূষণ উৎসগুলিকে বন্ধ করা অথবা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা। পশ্চিমবঙ্গে পলতা এবং উলুবেড়িয়া অঞ্চলে দূষণের অন্যতম সূচক ব্যায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড সংক্ষেপে বি ও ডি এর পরিমাণ যথাক্রমে ২.০৩ ও ২.৪৩ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। ২০০৫ সালে এই তথ্য থাকলেও ২০০৭ সালে এই পরিমাণ আরও বেড়েছে এবং ২০১১ সালে তা মাত্রাতিরিক্ত আকার ধারণ করেছে। গঙ্গা অববাহিকার ওপরে অবস্থিত ওজোনস্তরের অবস্থা কি সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, গঙ্গার জল এবং বায়ু দূষণের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে তার প্রভাব ওজোন স্তরের উপর পড়েছে এবং ফলে স্তরের ঘনত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। ওজোন স্তরের হ্রাসের ফলে গঙ্গা অববাহিকার বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গঙ্গা নদীকে পরিশোধন করে তার পুণ্যধারাতে স্নাত হয়ে আমাদের যাবতীয় কলুষ ধুয়ে ফেলার জন্য কেবল কিছু অর্থ বরাদ্দ আর বছরে একবার পদযাত্রা করলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না। গঙ্গানদী সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। নদীতে কোনওরকম আবর্জনা যাতে ফেলা না হয় সেদিকে আমাদেরই দৃষ্টি দিতে হবে। নদীতে শ্যাম্পু, সাবান ব্যবহার না করা, অপরিষ্কার বস্ত্রাদি না কাচা, নদীতে গরু মহিষ না ফেলা আমাদের কর্তব্য। এর সঙ্গে সঙ্গে আগামীদিনে গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জনের ব্যাপারেও আমাদের বাস্তবসম্মত চিন্তাভাবনার প্রয়োজন।

জল যেমন জীবন তেমন বহমান নদীও জীবন্ত। এই প্রাণময়তার পরিচয় রয়েছে নদীর মধ্যস্থ অসংখ্য জীবের মধ্যে। জীব জগতের সর্বনিম্ন স্তর ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে উচ্চতর স্তরের নানা ধরনের মাছ ও অন্যান্য প্রাণী যেমন শুশুক, কচ্ছপ, কুমীর নদীর জলে বসবাস করে। জীবন থাকলেই থাকে জীবন সংগ্রাম, গঙ্গাও তার থেকে মুক্ত নয়। এখন প্রশ্ন হলো, এর মধ্যে জীবন সংগ্রামের ব্যাপারটা কোথায় আসছে? কার সঙ্গেই বা কার সংগ্রাম? গঙ্গার দু'ধারে যত কলকারখানা গড়ে উঠেছে তাদের অধিকাংশেরই অভ্যাস নদীটিকে একটি বিশাল ডাস্টবিন হিসেবে গণ্য করা। যত কলকারাখানার বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত জঞ্জাল এই সমস্ত জলে ফেলা হয়। তাদের সবার উপর নজর রাখা কোনও সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। আসল প্রয়োজন দেশবাসীর চৈতন্য হওয়া। সেই চৈতন্য জাগানো সহজ কথা নয়। জলদূষণ রোধ করার জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থার অভাব নেই। টাকারও অভাব নেই। আসল সমস্যা রুচিবোধ। ঠিক যে কারণে যে কোনও রাস্তায় লোকে প্রস্রাব করে কিংবা থুতু ফেলে— ঠিক সে কারণেই বছর বছর ধরে এদেশের নদীনালার জলও দূষিত হতে থাকে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে হুগলি নদীর একটি ১০০ কিমি অংশের ভেতর মোট ৩৪৬টি বিভিন্ন নোংরা জলের ধারা এসে মিশেছে বাড়ি ও কলকারখানা থেকে। এই ৩৪৬টি ধারা বেয়ে ৬৭ লক্ষ কিউবিক মিটার নোংরা জলসমেত অন্যান্য জঞ্জাল প্রতিদিন এসে জলের অংশতে মেশে। যার মধ্যে বাড়ির ময়লা ২৩ লক্ষ কিউবিক মিটার ও কারখানার নোংরা বাকি ৪৪ লক্ষ কিউবিক মিটার। হুগলিতে সর্বমোট তরল বর্জ্য মেশার পরিমাণ প্রতিদিন ২৫০ মিলিয়ন গ্যালন। এর ফলে প্রতিদিনই হাজার হাজার জলজ প্রাণীর, মাছের মৃত্যু হচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে যে এই জলেই যখন আমরা স্নান করি তখন এই মাত্রাতিরিক্ত অপকারী ব্যাকটিরিয়া আমাদের শরীরেও ঢুকছে। অতএব নদীর জীবন সংগ্রাম আমাদেরও জীবন সংগ্রাম। এইজন্য চাই প্রত্যেকের সচেতন ভাবনা। কেবল কয়েকটি প্রদীপ জ্বালিয়ে বা কয়েক ঘড়া দুধ গঙ্গাতে ঢেলে গঙ্গার দূষণ সমস্যা রোধ করা সম্ভব নয়। দূষণ রোধ করতে গেলে কতকগুলি বিশেষ পরিকল্পনার প্রয়োজন।

যেমন নদীর ঘাটগুলির সংস্কার, নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে পর্যাপ্ত শৌচাগার স্থাপন, তীরবর্তী কলকারখানাগুলি যাতে বর্জ্য পদার্থ গঙ্গাতে না ফেলতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং জলের মান নির্ণয় পরীক্ষার জন্য আধুনিক কৃৎকৌশলের ব্যবস্থা করা। আগামীদিনে গঙ্গার দূষণমুক্ত নির্মল জল পান করার যোগ্য অধিকার যেন আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জন করতে পারি। ☐

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
Chicken Mutton
DUTA
Sabji Mix
kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

মুসলিম দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ মালদাবাসী

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। মালদা জেলায় হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বসবাসকারী গ্রামগুলিতে মুসলিম দুষ্কৃতীরা হিন্দুদের বাড়ীতে চুরি ডাকাতি করে ধরা পড়লে তাদের রক্ষার জন্য যেমন মুসলিমরা এগিয়ে আসছে তেমনি পুলিশ প্রশাসনও সহায়তা করছে। দুষ্কৃতীদের ধরতে গিয়ে পুলিশও আক্রান্ত হচ্ছে তবুও নিরপরাধ হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা হচ্ছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর কালিয়াচক থানার মোথাবাড়ী সিংপাড়ার সুরেন মণ্ডলের বাড়িতে পাশের গ্রামের সামাদ শেখ জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকে হার ছিনতাই করতে গেলে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এরপর গ্রামের লোকেদের গণপিটুনিতে সে মারা যায়। এই গণপিটুনির সময় হিন্দু ও মুসলিম সবাই ছিল এবং এর আগে সামাদ শেখের নামে বহু চুরি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ ছিল বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছে। রাত্রি ১টার সময় চুরির ঘটনায় গণপ্রহারে চোরটির মৃত্যু হলেও সকালবেলাতে মুসলিমরা গুজব রটিয়ে দেয় তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। পুলিশ সুরেন মণ্ডলের পরিবারের হরেন মণ্ডল, বাসু মণ্ডল ও সুবোধ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে খুনের অভিযোগে।

সুরেন মণ্ডলের স্ত্রী বন্দনা মণ্ডল বলেন, আমার দুই ভরির হার ছিনতাই করেছে। মোট তিনজন চোর ঢুকেছিল ঘরে কিন্তু দুজন হার নিয়ে পালিয়ে গেলেও সামাদ শেখ ধরা পড়ে যায়। এই ঘটনাতে উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ তাড়াতাড়ি না আসলে বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটতো এবং অন্যান্য এলাকা থেকে লোক আসতে শুরু করেছিল। সুরেন মণ্ডলের পরিবারের অভিযোগ আমাদের বাড়ীতে চোর ধরা পড়ল আর আমাদের লোকদেরই পুলিশ ধরে নিয়ে গেল? তদন্ত হোক কারা দোষী। চোর বাড়িতে ঢুকলে তবে কী তাকে ছেড়ে দিতে হবে? অন্যদিকে ওইদিনই হরিশচন্দ্রপুর হাসপাতালে জাল নোটের কারবারে জড়িত দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল। জাল নোট কারবারের সঙ্গে জড়িত সাঙ্গপাঙ্গোরা এদিন হাসপাতালে যাওয়া এক পুলিশ অফিসারকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে এবং তার মোটরবাইকটি ভাঙচুর করা হয়। পুলিশ জানিয়েছেন ২০ সেপ্টেম্বর বিকালে ২০ হাজার টাকার জাল নোটসহ মহম্মদ রানা ও সাহেব আলি নামে দুই কুখ্যাত জাল নোট কারবারিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে, গুজব রটিয়ে দেওয়া হয় যে একজনকে মেরে ফেলা হয়েছে পিটিয়ে। তার জের হিসেবেই মুসলিম দুষ্কৃতীরা সেই পুলিশ অফিসারকে মারধর করে। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে সেই অফিসারকে উদ্ধার করে ও ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে।

মালদার প্লাবিত এলাকায় ত্রাণ বন্টনে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। মালদা জেলার মানিকচক ব্লক, হরিশচন্দ্রপুরের বেশ কিছু এলাকায় গঙ্গা, ফুলহার ও মহানন্দা নদীর জল বাড়ায় গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হতে শুরু করেছে। মানিকচক ব্লকের জোতপাট্টা, রবিদাস পাড়া, শিবনটোলা গ্রামের একাংশ প্লাবিত হয়ে এলাকার ৫০টি পরিবার জলবন্দি হয়ে পড়েছে। ফুলহার নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বয়ে চলাতে সেখানে লাল সঙ্কেত জারি করা হয়েছে। মানিকচকের ভুতনিতে কিছুদিন আগে যে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ হয়েছিল সেই কাশুটোন টোলায় গঙ্গা বাঁধ জলের তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করেছে। এছাড়াও চাসাগ্রাম, ভুবনটোলা, মদনটোলা, রামনগর, ডোমহাট প্রভৃতি গ্রামগুলিতেও এদিন পর্যন্ত গঙ্গার ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। হরিশচন্দ্রপুরের উত্তর ও দক্ষিণ ভাকুরিয়া ও দিয়ারা গ্রামেও ফুলহারের জল ঢুকে পড়ায় ৫০টি পরিবার জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে রতুয়া-১ ব্লকের দেবীপুর ও কাহালা গ্রামে নতুন তৈরি বাঁধে থাবা বসিয়ে বাঁধের কিছু অংশ ধসে গেছে। পাশাপাশি সূর্যাপুর, বিষ্ণুপুর, কমলপুর, লক্ষ্মীপুর, মিঞাহাট গ্রামেও ফুলহার নদীর ভাঙন চলেছে।

অন্যদিকে ফুলহারের উপচে পড়া জলে ঘর ভেসে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা উঁচু রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছেন। এইরকম বৃদ্ধ সুবোধ পরিহার তার পরিবারের সাত সদস্য নিয়ে, পেশায় দিন মজুর এই ব্যক্তি একবেলা না খেয়ে, দীর্ঘ ছয়দিন উঁচু জায়গাতে কাটালেও কোনও ত্রাণ সামগ্রী পায়নি। প্রশাসনের কেউ তাদের খোঁজও করেনি। একইভাবে হরিশচন্দ্রপুরের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অসংরক্ষিত দিয়ারা গ্রামে উঁচু রাস্তার ধারে আশ্রয় নেওয়া পরিবারগুলি ত্রাণ না পেয়ে দিন কাটাচ্ছে। জেলা প্রশাসন বলেছে ১০ কুইন্টাল চাল বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্লাবিত এলাকাতে তা পৌঁছায়নি কেন, তার সদুত্তর দিতে প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন
মাত্র দুই মিনিটে ৈির তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন,
বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

কোকরাঝাড়ের দাঙ্গা এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশমাত্র

বাসুদেব পাল ॥ কোকরাঝাড়ে দাঙ্গা থেমেও থামেনি। সবথেকে করুণ অবস্থা বোধকরি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর। সাম্প্রতিক জাতিদাঙ্গা তাঁর ধোপদুরস্ত পোষাকে কালির কালো ছোপ এঁকে দিয়েছে। বোড়োরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের অসমের স্থায়ী বাসিন্দা অর্থাৎ নাগরিকত্ব দিতে চান তিনি। আর ত্রাণ শিবিরে বসবাসকারী মুসলমানদের অভিযোগ— গগৈ নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার বোড়োল্যান্ড এলাকায় মারমুখী বোড়োদের সংযত করতে পারছেন না।

কোকরাঝাড়ের জাতিদাঙ্গা কয়েকটি জেলায় ছড়িয়ে পড়া এবং দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় ধুবড়ির সাংসদ এবং অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (AIUDF)-এর প্রধান ধনকুবের (পারফিউম ব্যারন) বদরুদ্দিন আজমল-এর ব্যাপক প্রভাব কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ভালোমতো ধরিয়েছে— একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বোড়ো পীপলস্ ফ্রন্ট, বিজেপি, বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন বদরুদ্দিনের গ্রেপ্তার দাবী করলেও রাজ্যের শাসক দলের কর্তাদের মুখে একটিবারের জন্যও এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। কারণটা আর কিছুই নয়— মুসলমানদের 'ব্লক-ভোট' বা গুচ্ছ ভোটব্যাঙ্ক। যা ক্রমশঃ কংগ্রেস থেকে এ আই ইউ ডি এফ-এর শিবিরে অবস্থান বদল করছে। আবার, বোড়োদের দাক্ষিণ্য না পেলে ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেই অসমের রাজনীতির চালচিত্রটাই বদলে যেত— একথাটা অসমের রাজনীতি বিষয়ে সচেতন মানুষমাত্রই বিশ্বাস করেন। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বড়ো পীপলস্ ফ্রন্ট-এর বারোজন বিধায়কের সমর্থন না পেলে তরুণ গগৈ-এর উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হোত না। যে কারণে ২০১১-তে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও কৃতজ্ঞ তরুণ গগৈ কংগ্রেস-বি পি এফ জোট বজায় রেখেছেন। রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করার পরও বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যান হাগ্রামা মহিলারি একই কথা বলেছেন। বস্তুতপক্ষে অসমে দীর্ঘসময়ব্যাপী কংগ্রেস দল পরিচালিত রাজ্য সরকার ভারত ভাগের মূল কারিগর মহম্মদ আলি জিন্নার ব্যক্তিগত সচিব মইনুল হক চৌধুরীর আপ্তবাক্য (Wait for ten years, I will present you Assam in a silver plate) যা উনি সেই সময় জিন্নাকে প্রতিশ্রুতির আকারে দিয়েছিলেন, তাকেই কার্যকর করেছে। আর রাজনীতি ও ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হওয়া অসমীয়া হিন্দু ও বাঙালী হিন্দুরা পরস্পর কোন্দল করে উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে মূল সমস্যা থেকে লুকিয়ে পরিত্রাণের পথ খুঁজেছে। ফলে সমস্যা দিন দিন বেড়েছে বই কমেনি।

১৯০১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত পাঁচ দশকে অসমে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে ৩৯৬ শতাংশ, পরবর্তী ২০ বছরে ৯৩ শতাংশ বেড়েছে। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে অসমে মোট মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার। রাজ্যের জনসংখ্যার ১১.৭ শতাংশ মাত্র। ১৯৭১-এ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬ লক্ষে, রাজ্যের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে ২৪.০৩ শতাংশ।

বছর	সারা ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতাংশে)	অসমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বৃদ্ধির হার (শতাংশে)
১৯০১-১১	৫.৭	১৬.৮
১৯১১-২১	০.৩	২০.২
১৯২১-৩১	১১.০	২০.১
১৯৩১-৪১	১৪.২	২০.৫
১৯৪১-৫১	১৩.৩	২০.১
১৯৫১-৬১	২১.৬	৩৪.৭
১৯৬১-৭১	২৪.৬	৩৫.০

১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর অসম বিধানসভায় মুসলমান সদস্য ছিল মাত্র ৬ জন। ১৯৭৭ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ২৮ জন। ১৯৭৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভার মুসলমান সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাদের এক বৈঠকে এই সংখ্যা ৬০ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একটাই উদ্দেশ্য--- স্থায়ীভাবেই যাতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হন একজন মুসলমান।

আশির দশকে উত্তাল 'অসম আন্দোলন'-এর মূলে ছিল--- বিদেশী নাগরিকদের দ্বারা অসম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা এবং নিজ বাসভূমে সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ার বিপদ। বিদেশী এবং বিপজ্জনক কে— এই বিষয়ে সঠিক বাস্তবানুগ ও যুক্তিপূর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ না থাকার কারণে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সুফল অসমবাসীর করায়ত্ত হয়নি। অসমীয়া হিন্দু ও বাঙালী হিন্দুদের পরস্পর বিরোধী মনোভাব এবং বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলনে সত্যিকার অনুপ্রবেশকারী বিদেশী ও বাংলাদেশী মুসলমানদের প্রতি সহানুভুতিসম্পন্ন মুসলমান সমাজের একাংশকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে অসম আন্দোলন (বিদেশী বিতাড়ন) সাফল্য লাভ করতে পারেনি। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্ব সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দিয়ে রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হলেও বিদেশীদের বিতাড়ন তো দূর, তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেননি। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব এবং প্রচলিত রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এজন্য কিছু পরিমাণে দায়ী। তবে এতদ্‌সত্ত্বেও সদিচ্ছার অভাব অবশ্যই ছিল।

সুদূর প্রসারী চক্রান্ত :

১৯৪১ সালের সেনসাস রিপোর্টে অসমে মুসলমান লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পায়। কারণ হিসেবে বলা হয়— প্রধানত ময়মনসিং এবং পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে অনুপ্রবেশের ফলে অসমে মুসলমান

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। অসমকে বাংলার মুসলমান উপনিবেশে পরিণত করার নীতি যৌথভাবে অসমে স্যার সাদুল্লা এবং বাংলায় নাজিমুদ্দিন কার্যকর করতে থাকেন। ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে অসমে গোপীনাথ বরদলৈ-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতনের পর স্যার সাদুল্লা অসমের প্রধানমন্ত্রী (তখন প্রধানমন্ত্রীই বলা হোত) নিযুক্ত হন। তিনিও অধিক খাদ্য উৎপাদনের অছিলায় অসমে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন লর্ড ওয়াভেল মন্তব্য করেছিলেন--- 'অসম সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে--- অধিক মুসলমান উৎপাদন কর (Grow more muslism)। চল্লিশের দশকের মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের স্লোগানই ছিল—

'উপরে আল্লা, নীচে সাদুল্লা
চলো ভাই ও শালা,
যা করে আল্লা!'

পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে সম্প্রসারণের (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ) বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়, শেখ মুজিবর রহমানের লেখা পুস্তক— পূর্ব পাকিস্তান : এর লোকসংখ্যা, সংকল্প ও অর্থনীতি (Eastern Pakistan : It's Population Ditermination and Economics) থেকে। তিনি লিখেছিলেন, 'যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের বিশাল লোকসংখ্যার জন্য প্রচুর জমি দরকার এবং অসমে এই সম্প্রসারণের পূর্ণ সুযোগ আছে, যেহেতু অসমের প্রচুর বনসম্পদ ও খনিজ সম্পদ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি রয়েছে, সেইহেতু পূর্ব পাকিস্তানকে আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী হতে গেলে অসমকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নিতেই হবে।'

পাকিস্তানের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো ১৯৬৮ সালে তাঁর লেখা বই-'স্বাধীনতার নিগূঢ় রহস্য' (The Myth of Independence)-এ অসমের প্রতি পাক-নেতৃত্বের না-পাক (অশুভ) মনোভাবের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'একথা মনে করা ভুল হবে যে, কাশ্মীরই একমাত্র সমস্যা যেটা ভারত ও পাকিস্তানকে বিভক্ত করে রেখেছে, যদিও নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।... কিন্তু অন্যটাও অন্ততঃ কাশ্মীর নিয়ে বিবাদেরই প্রায় সমান। সেটা হলো অসম এবং পূর্ব পাকিস্তান সংলগ্ন ভারতের কয়েকটি জেলা।...'

সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রেরই ফল কোকরাঝাড় ও সন্নিহিত কয়েকটি জেলায় সাম্প্রতিক বড়ো জনজাতি ও বাংলাদেশী মুসলমানদের জাতি-দাঙ্গা। বড়ো জনজাতিরা জমি জবরদখল, জনসংখ্যার জটিল অঙ্কে সংখ্যালঘু হওয়ার আশঙ্কা থেকে মারমুখী হয়ে ওঠে। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত ২১৫টি ত্রাণশিবিরে ২৩৫,০০০ মানুষ। অনেকেই দাঙ্গাকারীদের ভয়ে বাসস্থানে ফিরতে রাজী নন। ত্রাণশিবির রয়েছে কোকরাঝাড়, চিরাং, ধুবড়ি ও বনগাঁইগাঁও জেলায়। গত ২৭ আগস্ট বোড়োল্যান্ড পীপলস্ ফ্রন্ট-এর এক প্রতিনিধিদল হাগ্রামা মহিলারির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীলকুমার সিন্ধেকে এক তথ্যপঞ্জী (dossier) তুলে দিয়েছেন। সেখানে মহিলারিরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন— বোড়োল্যান্ড এলাকার ৭৮০০০ হেক্টর জমি বাংলাদেশীরা জবরদখল (encroched) করেছে। সেজন্য ত্রাণশিবিরে আশ্রিতদের জমির মালিকানার কী প্রমাণপত্র আছে তা তাঁরা (বোড়ো নেতৃবৃন্দ) খতিয়ে দেখতে চান। এবং বৈধ কাগজপত্র দেখার পরই তাদেরকে ঘরে ফিরতে দেওয়া হবে। এদিকে রাজ্য সরকার এবং কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ২০১১-এর ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষজনকে ঘরে ফেরাতে চান। গত ২৯ আগস্ট কোকরাঝাড়ে অসম সরকারের পাঁচজন মন্ত্রীর সঙ্গে বোড়ো নেতৃবৃন্দের দীর্ঘ বৈঠকের পরও অচলাবস্থার অবসান হয়নি। বোড়ো পীপলস্ ফ্রন্টের একজন উপরস্তরের নেতার কথায়— 'আমাদের নেতারা মুসলমানদের সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যের জন্য কথা বলবেন। যাতে পরিবেশ অনুকূল হয়। প্রত্যেকটি ভারতীয় মুসলমান এখানে সুরক্ষিত ও নিরাপদ। তবে তার মানে এই নয় যে, আমরা বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট-এ অনুপ্রবেশকারীদের বসতি স্থাপন করতে দেব। পরবর্তী বৈঠকে বি টি এ ডি এলাকার জমির হোল্ডিং রেকর্ড সবার সামনে তুলে ধরা হবে। ওই রেকর্ডের ভিত্তিতেই পুনর্বাসন পদ্ধতি স্থির হবে।'

ত্রাণশিবিরের জনৈক মুনসেফ আলি'র বক্তব্য--- 'আমি অসমে জন্মেছি, ভোটার তালিকায় আমার নাম আছে। আমি কিন্তু কিছু প্রমাণ করতে পারব না।' সে চিরাং জেলার বিদ্যাপুর হাইস্কুলে আছে। এ বিষয়ে এক বোড়ো নেতার বক্তব্য, অসমে ভোটার তালিকায় নাম তোলানো তো 'জলভাত'।

উত্তর পূর্বাঞ্চলবাসীদের দেশের নানা স্থানে ভীতি প্রদর্শন ও হিংসাত্মক বদলার সম্ভাবনার কথা বলেছে মুসলমানরা। এর ফলে, রাজ্যের জনতা আড়াআড়ি দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে— মুসলমান ও অমুসলমান। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। গত ২৭ আগস্ট বজরং দল বদরুদ্দিন আজমলের গ্রেপ্তারের দাবীতে সারা অসম 'বন্ধ' ডেকেছিল। সর্বাত্মক বন্ধ। পরদিন আমসু (অল অসম মাইনরিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন) পাল্টা বন্ধ ডাকে। আমসু ক্যাডারদের হাতে সরকারি অফিস, মন্ত্রী এমনকী সাংবাদিকরাও আক্রান্ত হন। বন্ধে অনেক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। পরে আমসু (AAMSU) নেতারা দুঃখ প্রকাশ করে কর্তব্যে ইতি টানে। তারা পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরুর আগেই বোড়োল্যান্ডভুক্ত এলাকায় সম্পূর্ণ সামরিক অভিযান চান। সশস্ত্র বোড়ো গোষ্ঠী এবং বোড়ো পুলিশ এবং বোড়ো প্রশাসনিক অধিকারীদেরও অপসারণ দাবী করছেন আমসু নেতারা।

কংগ্রেস হাইকম্যান্ড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। দলের আশঙ্কা, এর ফলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে দলের মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে ধস নামবে। দিশাহীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে নামিয়েছেন অঘোষিতভাবে। সমস্যা সমাধানের উত্তর মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর জানা নেই। সব মিলিয়ে মুসলমান ভোট এককাট্টা হয়ে বদরুদ্দিনের দলের ঝুলিতে পড়লে অসমে মহম্মদ কয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন শেঠ বদরুদ্দিন আজমল। তখন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অসমীয়া, বাঙালী, অবাঙালী ও জনজাতি হিন্দুদের পায়ের তলার মাটি ক্রমশ আলগা হতে থাকবে। কেননা হিন্দুভোট ভাগ হবেই। হিন্দুরা এখনও বুঝতে পারছেন না তাদের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী কারা— কংগ্রেস, অগপ, বিজেপি নাকি বদরুদ্দিন আজমল! ☐ ☐

Ori Plast

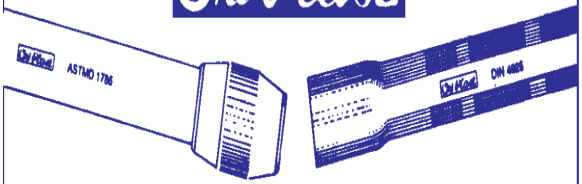

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

“সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়”

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

[*কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘স্বামী শ্রদ্ধানন্দ’ প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩*]

সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল

৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে স্টল করতে আগ্রহীরা নিম্নলিখিত বইগুলির জন্য যোগাযোগ করুন

হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদী বইয়ের বিশাল সংগ্রহ
বইগুলি পড়া একান্ত জরুরী

- স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্র চিন্তা ২০ টাকা।
- বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ ৫০ টাকা।
- বিপ্লবী বীর সাভারকর ৩০ টাকা।
- প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ৫০ টাকা।
- নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ (তথাগত রায়) ৮০ টাকা।
- মুসলিম তোষণ ও দেশের সর্বনাশ ১২ টাকা।
- ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তরালে ৫০ টাকা।
- ইসলামের স্বরূপ ১২ টাকা।
- দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই ৩ টাকা।
- মমতার ইমাম বন্দনা এবং প্রণামী ২৫ টাকা।

আরও অনেক হিন্দুত্ববাদী বইয়ের বিপুল সম্ভার।
আকর্ষণীয় কমিশনে বই নিন।
অবিক্রীত বই অক্ষত অবস্থায় ফেরত দিলে মূল্য ফেরত।
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
মোবাইল : ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

এ আই টি এ-র কাছে মহেশদের এই শাস্তিই প্রাপ্য ছিল

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহেশ ভূপতি ও রোহন বোপান্নাকে দুবছর নির্বাসন দিয়ে অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশন ঠিক কাজই করেছে। যদিও এই শাস্তির প্রেক্ষিতে মহেশরা আদালতে যাবার হুমকি দিয়েছে। আর সেই হুমকির কথা শুনে এ আই টি এ খানিকটা

মহেশ ভূপতি

নড়েচড়ে বসেছে এবং জানিয়েছে শাস্তির সাপেক্ষে কিছু বলার থাকলে তারা আবেদন করতে পারে। আর তাতে যদি টেনিস কর্তারা দুর্বল হয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে তাহলে তার চাইতে অবিমৃষ্যকারী কাজ আর কিছু হবে না। ভবিষ্যতে এদেশের জুনিয়র টেনিস খেলোয়াড়রাও আর পাত্তা দেবে না এ আই টি এ-কে। যে যেমন খুশি আচরণ করে পার পেয়ে যাবে। আর বিশ্বের দরবারে ভারতীয় টেনিসের যে সুনাম ও গৌরবগাথা আছে তা কলঙ্কিত হবে। টেনিস খেলাটারও দশা হবে ফুটবল, হকির মতো। তিনবার বিশ্ব টিম চ্যাম্পিয়ানশিপ ডেভিস কাপের ফাইনালে খেলেছে ভারত। রমানাথন কৃষ্ণন বিশ্বের প্রথম পাঁচ খেলোয়াড়ের মধ্যে ছিলেন। বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ, রমানাথন পুত্র রমেশ কৃষ্ণন সবাই নিজের সেরা সময়ে এটিপি সার্কিটে সমাদৃত খেলোয়াড় ছিলেন। আর সাম্প্রতিককালে লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতির হাত ধরে বহুবার ভারতে এসেছে দুর্মূল্য গ্রান্ডস্লাম। লিয়েন্ডার অলিম্পিক সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জজয়ীও বটে। এদের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে উঠে এসেছেন রোহন বোপান্নাও। এখন যদি দায়িত্ব নিয়ে মহেশ, রোহনেরা এই ঐতিহ্যকে ধরাশায়ী করে তাহলে তাদের অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্য। আর লিয়েন্ডারকে ধোয়া তুলসীপাতা মনে করে ন্যূনতম শাস্তিও না দেওয়া হয়, সেটাও এ আই টি এ-র অদূরদর্শিতাকে প্রকট করে তুলবে।

কেন লিয়েন্ডারকে ছাড়া চলবে না? কারণ লিয়েন্ডার লন্ডন অলিম্পিকের সময় বায়না জুড়ে দিয়েছিলেন মিক্স ডাবলসে সানিয়া ছাড়া কারুর সঙ্গে জুটি বাঁধবেন না। আর পুরুষ ডাবলসে একান্তই বাধ্য হয়ে বিষ্ণু বর্ধনকে মেনে নিয়েছিলেন যথেষ্ট গাঁইগুই করে। এর আগে

রোহন বোপান্না

একাধিকবার সার্কিটে মহেশের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন এবং পরে ভেঙে দিয়েছেন। সব ক্ষেত্রে মহেশকে দোষী ঠাওরালে ভুল বিচার হবে। লিয়েন্ডারও নানা ইস্যুতে গণ্ডগোলে জড়িয়ে মহেশকে ত্যাগ করেছেন। বিশ্ব টেনিস সার্কিটে এই জুটি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তা নিজেরাই নিজেদের হাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। এরকম ভাঙাগড়ার মাধ্যমে ভারতীয় টেনিসই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা কি এই দুই পোড়খাওয়া খেলোয়াড় বোঝেন না? নতুন প্রজন্মের উঠতি খেলোয়াড়দের সামনে কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন তাঁরা? গ্রান্ডস্লাম জিতে, অসংখ্য এটিপি টুর্নামেন্টে চাম্পিয়ন হয়ে ভারতবর্ষের টেনিস ভবিষ্যতের সাপেক্ষে যেমন সোনালী দিকচক্রবাল এঁকে দিয়েছেন তেমনই বারে বারে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে জুটি ভেঙে তরুণ প্রজন্মকে দিশেহারাও করে দিয়েছেন।

অথচ এই জুটির কাছে অলিম্পিক পদক ছিল হাতের মোয়া। বাস্তবে কি দেখা গেল না চার চারটে অলিম্পিকে একসঙ্গে ডাবলস খেলেও পদক অধরা। এর কারণ অলিম্পিকের আগে বারে বারে বিচ্ছিন্ন হওয়া। তাই অলিম্পিক শুরুর এক সপ্তাহ কি দু সপ্তাহ আগে ফের জুটি বেঁধে নামমাত্র অনুশীলন বা টুর্নামেন্ট খেললে সমন্বয় দানা বাঁধে না। এবছর তাই লন্ডন অলিম্পিকে আলাদা আলাদা পার্টনার নিয়ে খেলেছেন লি-হেশ। লি-র সঙ্গী বিষ্ণু তেমন আহামারি খেলোয়াড় নন, দুজনে কোনওদিন একসঙ্গে খেলেনওনি। কিন্তু মহেশ ও রোহন সার্কিটে প্রায় একবছর একসঙ্গে খেলছেন। ২/৩টি এটিপি টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলেছেন, একটি জিতেছেন। তাই তাদের কাছে অলিম্পিকে এরকম হতাশজনক ফলাফল প্রত্যাশিত ছিল না। আসলে অলিম্পিকের আগে লি-হেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে বাক্‌যুদ্ধ চালিয়ে নিজেদের ফোকাসটা নড়িয়ে দিয়েছিলেন। যেরকম কদর্য লড়াই তারা করেছেন পরস্পরের বিরুদ্ধে তাতে বিশ্ব সার্কিটে যেমন মুখ পুড়েছে ভারতীয় টেনিসের, তেমনি দেশের টেনিস শিক্ষার্থীদেরও মানসিক স্থিতিটা দুর্বল করেছেন।

এখন দেশের ডেভিসকাপ টিম গড়াই একটা সমস্যার। সব খেলোয়াড়রা স্পষ্টত দুটি গ্রুপে বিভক্ত। কেউ লি-র দিকে কেউ বা মহেশের শিবিরভুক্ত। আর যারা সাব জুনিয়র স্তরের খেলোয়াড় তারাও বুঝতে পারছেন না দুই মহারথীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কার্যকারণটি। লি-হেশ দুজনেই ৪০-এর কোঠায় পৌঁছে গিয়েছেন। এদের টেনিস ভবিষ্যত বলে আর কিছু নেই। যদিও এবছর বিদেশী পার্টনারকে নিয়ে ৪০-এর লিয়েন্ডার দুটি মেজর গ্রান্ডস্লাম ডাবলস ফাইনাল খেলে একটিতে জয়ীও হয়েছেন। মহেশের অবশ্য তেমন বড়মুখ করে বলবার মতো সাফল্য নেই। মাঝখানে থেকে বড় ক্ষতি হয়ে গেল রোহন বোপান্নার। সবে ৩১/৩২ বছর বয়স। আরও ৩/৪ বছর সার্কিটে ডাবলসে দাপিয়ে খেলে যাবার কথা, যদিও এ আই টি এর শাস্তিতে পেশাদার সার্কিটে খেলা আটকাবে না। কিন্তু তার ফোকাসটা ঠিক থাকবে তো এটিপিতে? দেশের মানুষের কাছে ভিলেন প্রতিপন্ন হওয়া রোহন কতটা নিজেকে মেলে ধরতে পারবেন ট্যুর সার্কিটে। তবে রোহন একটা সিদ্ধান্ত ঠিক নিয়েছে। বুড়ো মহেশকে ছেড়ে পুরনো পার্টনার পাকিস্তানের আইসাম কুরেশীকে নিয়ে সার্কিটে খেলবেন। এই জুটি ২০১০-এর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে রানার্স আর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট খেতাবজয়ী। ইন্দো-পাক এক্সপ্রেসকে ফের স্বমহিমায় দেখা যেতে পারে যদি রোহন সব ভুলে নতুন করে শুরু করতে পারেন। আর ডেভিস কাপের জন্যও তরুণরা উন্মুক্ত বাতাবরণ পেয়ে যাবেন।

শব্দরূপ-৬৪৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

					১		২
	৩		৪				
৫			৬				
৭							
				৮			
		৯					
				১০			
১১							

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. দাবিত্যাগ, ৩. স্বর্ণ, ৬. ভারুই পাখী, ৭. (ব্যঙ্গে) ধেনো মদ, ৮. কৃষ্ণের পিতা, ৯. শিব; প্রচণ্ড, ভীষণ, ১০. ধনুকের জ্যা টেনে ছেড়ে দিলে যে শব্দ হয়, ১১. দুই বাহু দুই পদ মস্তক ও কটি।

উপর-নীচ : ১. সাবালক; সমর্থ; উপযুক্ত, ২. ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকটবর্তী বৃহৎ সরোবর, ৪. খোঁপা, কেশবিন্যাস, ৫. অদৃষ্ট নিয়ামক দেবপুরুষ; তিনি শিশুর ললাটে তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী লিখিয়া যান— এই ধারণা সাধারণ লোকে পোষণ করে, ৮. বোলতা; একে-দুয়ে আশীর্বাদ, ৯. অতনু, মদন।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৪০

			বৃ		অ	ট	বি
	ব	রা	হ		ড্ডু		পি
বি			স্প	ন্দি	ত		ন
প	শু	প	তি				বি
দ				দ	র	মা	হা
ভ		গ	বা	ক্ষ			রী
ঞ্জ		ঙ্গা		ক	দ	মা	
ন	দী	জ		ন্যা			

সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৬৪৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৯ নভেম্বর, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না। রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা– (সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ১৫

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

জাতীয় পরম্পরার মেলবন্ধন রূপসাগরে অরূপরতন

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪১৯

—: উপন্যাস :—

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত □ সুমিত্রা ঘোষ □ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

—: প্রবন্ধ :—

আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়— রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। **তিলকের প্রথম কারাবরণ : শিবাজী উৎসব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট** — গুরুপদ শাণ্ডিল্য। **রাষ্ট্রপরিচালনায় 'খড়ের মানুষের' উপদ্রব**— প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়। **বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ**—তথাগত রায়। **ভারত বনাম ইন্ডিয়া**— অমলেশ মিশ্র। **গাণিতিক বিস্ময় শ্রীনিবাস রামানুজন**— দেবীপ্রসাদ রায়। **বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানদর্শন ও জাতীয়তাবোধ**— অচিন্ত্য বিশ্বাস। **রহস্যময় গঙ্গারিডি সভ্যতা**— সমিত দে। **আন্দামান দর্শন**— দীনেশ চন্দ্র সিংহ। **রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও মানবসম্পদ বিকাশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা** — সত্যনারায়ণ মজুমদার। **রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের শতবর্ষ : দেশে দেশে ডাকঘর**— বিকাশ ভট্টাচার্য। **সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেবী দুর্গা**— সন্দীপ কুমার দাঁ। **বাঙালিবাবুর বৈঠকখানা**— অর্ণব নাগ। **মাধেরার সূর্যমন্দির**— সৌমেন নিয়োগী।

—: গল্প :—

রমানাথ রায় □ শেখর বসু □ গোপালকৃষ্ণ রায় □ জিষ্ণু বসু □ দীপঙ্কর দাস □ রত্না ভট্টাচার্য □ গোপাল চক্রবর্তী

—: রম্যরচনা :—

ধামালি— চণ্ডী লাহিড়ী। **ডি লা গ্র্যান্ডি দাদাগিরি ইয়াক ইয়াক**— পিনাকপাণি ঘোষ।

—: ভ্রমণ :—

সিন্ধু দর্শনে— বিজয় আঢ্য।

—: দেবীবন্দনা :—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী— ভিক্ষুদেব ভট্ট

সব মিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো একটি সংরক্ষণযোগ্য পুজো সংখ্যা

সত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৬০ টাকা।